لا اله الا الله محمد رسول الله

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

# পাক্ষিক আহ্‌মদী

# THE AHMADI

Fortnightly

হেলালউদ্দীন আহমদ
৩৪১, ডি, পি, রোড,
নারায়ণগঞ্জ।

নব পর্যায়ে ৫৪ তম বর্ষ ।। ১৬শ সংখ্যা

৫ই রমযান, ১৪১৩ হিঃ ।। ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৯৯ বাংলা ।। ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশ ১৫ পাউণ্ড ।।

# সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ১৬শ সংখ্যা ( ৫ঃতম বর্ষ ) পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন ( সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ )
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ ঃ রোযা ও উহার গুরুত্ব ৪

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
অনুবাদ : জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৬

জুমুআর খুত্‌বা
হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' ( আইঃ )
অনুবাদ : মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী ১০

৬৯তম সালানা জলসার সমাপ্তি ভাষণ ঃ
মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর ১৯

আমাদের লংমার্চ
আলহাজ্জ এ, টি, চৌধুরী ৩৩

কবিতা ঃ ধন্য কাফের ( ? )
জনাব আহমদ সেলবর্ষী ৩৪

সিয়াম সাধনা
জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৩৫

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঃ মানবধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য
অধ্যাপক যতীন সরকার ৪২

ছোটদের পাতা
কবিতা ঃ তিফল যারা
জনাব মুহাম্মদ সেলিম খান ৪৬

সংবাদ ৪৭

সম্পাদকীয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ  وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

# আহ্‌মদী

৫৪তম বর্ষ : ১৬শ সংখ্যা

২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ : ২৮শে তবলীগ, ১৩৭২ হিঃ শামসী : ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ

## কুরআন মজীদ

### সূরা আল্‌ বাকারা—২

২৬০। অথবা সেই ব্যক্তির ন্যায় (তুমি কাহাকেও কি লক্ষ্য করিয়াছ?) যে এমন এক শহরের (৩২২) পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম করিয়াছিল যাহার ছাদসমূহ ধ্বসিয়া ভূপতিত হইয়াছিল (এই দৃশ্য দেখিয়া) সে বলিল, 'ইহার ধ্বংসের পর আল্লাহ্‌ কখন ইহাকে পুনরুজ্জীবন দান করিবেন?' ইহাতে আল্লাহ্‌ তাহাকে একশত (৩২৩) বৎসরের জন্য মৃত্যু দিলেন, অতঃপর তিনি তাহাকে পুনরুত্থিত করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি (এই অবস্থায়) কতকাল ছিল'? সে বলিল, 'একদিন বা একদিনের (৩২৩-ক) কিয়দংশ অবস্থান করিয়াছি।' তিনি বলিলেন, (ইহাও ঠিক), 'বরং (৩২৩-খ) তুমি এই অবস্থায় একশত (৩২৪) বৎসর ছিলে (ইহাও ঠিক); তুমি তোমার খাদ্যদ্রব্যের এবং পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর, ঐগুলি পচে নাই, এবং তুমি তোমার গর্দভের প্রতি লক্ষ্য কর'। এবং আমরা (এইরূপ এই জন্য করিয়াছি) যেন তোমাকে মানব জাতির জন্য এক নিদর্শন করিতে পারি। এবং তুমি অস্থি-গুলির প্রতিও লক্ষ্য কর, কিরূপে আমরা উহাদিগকে সংযোজিত করি, অতঃপর, আমরা উহাদিগকে মাংসের আবরণ পরিধান করাই।' অতঃপর যখন প্রকৃত তত্ত্ব তাহার নিকট প্রকাশ হইয়া গেল, তখন সে বলিল 'আমি জানি যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বিষয়ের (৩২৬) উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান'।

---

৩২২। এই আয়াতে ধ্বংসপ্রাপ্ত যে নগরীর উল্লেখ আছে, তাহা হইল জেরুযালেম। ব্যাবিলনের রাজা নবুখদ নিৎসর (বুখ্‌তানাসার) ৫৯৯ খৃষ্টপূর্বে এই নগরটি দখল করিয়া ইহার সব কিছু ধ্বংস করিয়া প্রেতপুরীতে পরিণত করে। ইহার অধিবাসী ইহুদীদিগকে বন্দী করিয়া ব্যাবিলনে লইয়া যায়। এই বন্দীদের মধ্যে যিহিষ্কেল নবীও ছিলেন। বিজয়ীরা যিহিষ্কেলকে বীভৎসভাবে বিধ্বস্ত নগরীর করুণ দৃশ্য দেখাইয়া লইয়া যাইতে থাকে।

৩২৩। যিহিষ্কেল স্বভাবতঃই এই বীভৎস দৃশ্যাবলী দেখিয়া মর্মাহত হইলেন। তিনি কাতর হৃদয়ে প্রার্থনা করিলেন, হে প্রভু! এই নগরী না জানি কতদিনে জীবন ফিরিয়া পাইবে; ধ্বংসের পরেও আবার কখন ইহাতে প্রাণের স্পন্দন জাগিবে। তাহার প্রাণের দরদভরা দোয়া আল্লাহ্ শ্রবণ করিলেন। তাহাকে স্বপ্নে বা কাশ্‌ফে (দিব্য-দৃষ্টিতে) দেখানো হইল, তাঁহার প্রার্থিত নগরীর পুনর্জ্জীবন লাভ একশত বৎসরের মাথায় সম্পন্ন হইবে। আয়াতটিতে একথা বুঝায় না যে, যিহিষ্কেল একশত বৎসর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় ছিলেন এবং তৎপর জীবিত হইয়া উঠিলেন। কাশ্‌ফে বা স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তু বা বিষয়কে কুরআন, এমনভাবেই উল্লেখ করে, যেন সেই বস্তু, বিষয় বা ঘটনা প্রকৃত পক্ষেই ছিল বা ঘটিয়াছিল; স্বপ্ন বা কাশ্‌ফের কথা উল্লেখই করা হয় না (১২:৫)। যিহিষ্কেল তাঁহার কাশ্‌ফের অর্থ বুঝিয়াছিলেন। ইহার অর্থ এই যে, বনী ইসরাঈল জাতি একশত বৎসর পর্যন্ত অসহায় নির্যাতিত ও অপদস্থ অবস্থায় বন্দী হিসাবে থাকিবে। তারপর তাহারা নব চেতনায় জাগ্রত হইয়া, নূতন জীবন লাভ করিবে এবং তাহাদের পবিত্র ভূমি জেরুযালেমে ফিরিয়া আসিবে। যিহিষ্কেলের কাশ্‌ফ বা স্বপ্ন অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছিল। নবুখ্‌দ নিৎসর খৃঃ পূঃ ৫৯৯ অব্দে জেরুযালেম দখল করিয়াছিল (২ রাজাবলী-২৪:১০)। যিহিষ্কেল কাশ্‌ফ দেখেন সম্ভবতঃ খৃঃপূঃ ৫৮৬ অব্দে। আর ইহা পুনঃ নির্মিত হয়, ধ্বংসপ্রাপ্তির পূর্ণ এক শতাব্দী পরে। পুনঃ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয় খৃঃ পূঃ ৫৩৭ অব্দে মিদিয়ার সম্রাট সাইরাসের অনুমতি ও সাহায্য নিয়া। পুনঃ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয় খৃঃ পূঃ ৫১৫ অব্দে। ইসরাঈলীরা পুনর্বাসনের জন্য ব্যাবিলন রাজ্য ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে আসিতে আসিতে আরও ১৫ বৎসর লাগিয়া যায় এবং খৃঃ পূঃ ৫০০ সনে জেরুযালেম নগরীতে আবার প্রাণ চাঞ্চল্য দেখা দেয়। বনী ইস্‌রাঈল জাতি মৃতপ্রায় অবস্থা হইতে পুনরায় এক নব জীবন লাভ করিল। একথা শিশুসুলভ বলিয়া মনে হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা যিহিষ্কেলের মৃত্যু দিয়া ঠিকই একশত বৎসর পর্যন্ত মৃত রাখিয়া, তৎপর তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। এইরূপ করা তো যিহিষ্কেলের প্রার্থনার সাথে সঙ্গতিহীন। যিহিষ্কেল তাঁহাকে বা কোন ব্যক্তিকে, মৃত্যুদানের পর পুনরুত্থানের জন্য প্রার্থনা করেন নাই। তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, নূতনগরী যেন জীবন পায়, বিধ্বস্ত জেরুযালেম যেন পুনরায় উহার অধিবাসীকে ফিরিয়া পায় ও প্রাণচাঞ্চল্যে ভরিয়া উঠে।

৩২৩-ক। এই কথাটি অনির্দিষ্ট সময় বুঝাইয়া থাকে (১৮:২০; ২০:১৪) এবং কুরআনের বাগ্‌ধারা অনুযায়ী ইহা বুঝায় যে, যিহিষ্কেল ঐ অবস্থায় কতক্ষণ ছিলেন নিজেও জানিতে পারেন নাই। 'ইয়াওম' এখানে ২৪ ঘন্টার দিনকে বুঝায় নাই, বরং অবাধ ও অনাপেক্ষিক সময়কেও বুঝাইতেছে (১:৪ দেখুন)। আমি একদিন বা দিনাংশ (এই অবস্থায়) ছিলাম এই বাক্যটি দ্বারা যিহিষ্কেলের নিদ্রাবস্থায় ব্যয়িত সময়টিকে কিংবা স্বপ্ন দেখার সময়টিকেও বুঝাইতে পারে।

৩২৩-খ। 'বাল' আরবীতে এমন একটি বিয়োজন অব্যয় যাহা (ক) পূর্বে বিরত বিষয়টিকে খণ্ডন করে যেমন ২১:২৭, অথবা (খ) একটি আলোচ্য বিষয় হইতে অন্য বিষয়ের আলোচনায় যাওয়া যেমন ৮৭:১৭। এখানে 'বাল' শব্দটি শেষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩২৪। "ইহাও ঠিক, তবে তুমি এই অবস্থায় একশত বৎসর ছিল ইহাও ঠিক" এই বাক্যটির তাৎপর্য হইল, এক হিসাবে যদি যিহিষ্কেল ঐ অবস্থায় ১০০ বৎসর ছিলেন (কেননা কাশ্‌ফে বা জাগ্রত স্বপ্নে নিজেকে ১০০ বৎসর মৃত অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলেন) তথাপি তাঁহার এই কথাও সত্য যে, তিনি ঐ স্বপ্ন দর্শনাবস্থায় একদিন বা দিনাংশ কাটাইয়াছিলেন, কেননা স্বপ্নে বা কাশ্‌ফে বিষয়াদি দেখিতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় না।

৩২৫। এই সত্যকে যিহিষ্কেলের মনে গভীরভাবে আঁকিয়া দিবার জন্যে আল্লাহ্‌ তাঁহাকে তাঁহার খাদ্য, পানীয় ও গাধার দিকে তাকাইতে বলিলেন। ঐ খাদ্য ও পানীয় বাসি হয় নাই; তাঁহার গাধাও স্বস্থানেই জীবিতাবস্থায় আছে। "তোমার গর্দভের প্রতিও লক্ষ্য কর" বাক্যটা এই কথা প্রকাশ করে যে, যিহিষ্কেল মাঠে কাজের ফাঁকে গাধাকে পাশে রাখিয়া ঘুমাইয়াছিলেন, তখন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন কিংবা জাগ্রত অবস্থায় কাশ্‌ফী অবস্থায় নিজের মৃত্যু ও পুনর্জাগণের শত বর্ষের ব্যবধান দেখিয়াছিলেন। বন্দী অবস্থায় ইসরাঈলী-দিগকে ব্যাবিলনের ক্ষেতে খামারে কৃষি কার্য করিতে হইত।

৩২৬। যিহিষ্কেল সমগ্র ইহুদী জাতির প্রতিনিধিত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার একশত বৎসর মৃত অবস্থায় থাকার রূপক অর্থ হইল, তাহার জাতির বন্দী অবস্থায় শত বর্ষব্যাপী অসহায়, অপমানজনক, পদানত, দীনহীন, পরাধীন জীবন ধারণ। এই শতবর্ষের লাঞ্ছনার জীবন যাপনের পরেই ইসরাঈলী জাতি স্বকীয় সত্তায় নিজেকে আপন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এইভাবেই যিহিষ্কেল আল্লাহ্‌র নিদর্শনে পরিণত হইলেন। (যিহিষ্কেল ৩৭ অধ্যায় দেখুন)।

---

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাত শত আদেশের ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।"

(আমাদের শিক্ষা)—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

# হাদিস শরীফ

## রোযা এবং উহার গুরুত্ব

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, মানুষের প্রত্যেকটি কাজ তাহার নিজের জন্য কিন্তু রোযা আমার জন্য এবং আমি নিজেই ইহার পুরস্কার স্বরূপ হইব। অর্থাৎ তাহার পুণ্যের বিনিময়ে তাহাকে আমি আমার দর্শন দান করিব। আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন, রোযা ঢাল স্বরূপ, অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোযার অবস্থায় থাকে তাহার উচিত বাজে কথা, হট্টোগোল এবং খারাপ কাজ হইতে দূরে থাকা। যদি তাহাকে কেহ গালি দেয় অথবা মারামারি করিতে উদ্যত হয় তখন সে যেন এই জবাব দেয়, "আমি রোযাদার অবস্থায় আছি।". কসম সেই সত্তার যাঁহার হাতে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন রহিয়াছে রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌তা'লার নিকট মৃগনাভী হইতেও অধিক পবিত্র এবং সুগন্ধযুক্ত। রোযাদারের জন্য দুইটি আনন্দ রহিয়াছে একটি সেই সময় যখন সে রোযা ইফতার করে এবং দ্বিতীয়টি যেদিন সে খোদার দর্শন লাভ করিবে। (বুখারী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রোযা থাকিয়া মিথ্যা কথা হইতে এবং মিথ্যার উপর আমল করা হইতে বিরত না থাকে, আল্লাহ্‌তা'লার নিকট তাহার ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত থাকার কোন মূল্য নাই অর্থাৎ তাহার রোযা রাখা বৃথা। (বুখারী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যখন রমযান মাস আসে তখন জান্নাতের দুয়ার খুলিয়া দেওয়া হয় ও দোযখের দুয়ার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং শয়তানদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। (বুখারী)।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখে এবং (ঈদের দিন বাদ দিয়া) শাওয়ালের ছয় দিন রোযা রাখে তাহা হইলে সে এক বৎসর রোযা রাখার সওয়াব পাইবে কারণ প্রতি রোযার দশগুণ সওয়াব পাওয়া যায়, অতএব সে ৩৬০ দিনের সওয়াব পাইবে। (মুসলিম)।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, রোযার সময় সেহেরী খাইও কারণ সেহেরী খাইয়া রোযা রাখার মধ্যে বরকত রহিয়াছে। (বুখারী)।

হযরত সোহেল বিন সা'য়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, রোযার ইফ্‌তারী করিবার সময় যতদিন পর্যন্ত লোকে ত্বরান্বিত করিবে ততদিন পর্যন্ত তাহারা মঙ্গল ও বরকত লাভ করিতে থাকিবে। (বুখারী)।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি যদি ভুলবশতঃ রোযা অবস্থায় কিছু খাইয়া ফেলে, তাহার রোযা ভাঙ্গিবে না, বরং সে রোযা পূর্ণ করিবে। কেননা আল্লাহ্‌তা'লা তাহাকে পানাহার করাইয়াছেন সে নিজে জ্ঞাত অবস্থায় এইরূপ করে নাই। (বুখারী)।

হযরত যায়েদ বিন খালেদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রোযাদারকে ইফ্‌তারী করায় সেও একজন রোযাদারের সমান সোয়াবের অধীকারী হয় এবং রোযাদারের সওয়াবেও কমতি হইবে না। (তিরমিযী)।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূল করীম (সাঃ) রমযানের শেষ দশদিন এ'তেকাফে বসিতেন। তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত এইরূপ করিয়া গিয়াছেন, ইহার পর তাঁহার সহধর্মীণিগণও এ'তেকাফ করিতেন। (বুখারী)।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূল করীম (সাঃ)-এর নিকট আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লার রসূল! যদি আমি "লায়লাতুল কদর" লাভ করি আমি তখন কি দোয়া করিব? অতঃপর রসূল করীম (সাঃ) বলিলেন, এই ভাবে দোয়া করিবে,

اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى

হে আমার প্রভু! তুমি ক্ষমাকারী, তুমি ক্ষমা করাকে পসন্দ কর। আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও এবং আমার পাপও ক্ষমা করিয়া দাও।" (তিরমিযী)।

---

( ৯ম পাতার পর )

থাকেন, যেন তাঁহাদের খোদা এক পৃথক খোদা, যাহার সম্পর্কে জগদ্বাসী অনবহিত। তাঁহাদের সহিত খোদাতা'লা ঐ আচরণ করেন, যাহা তিনি অন্যদের সহিত কখনো করেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইব্‌রাহীম আলায়হেস সালাম সত্যবাদী ও খোদতা'লার বিশ্বস্ত বান্দা ছিলেন, সেহেতু প্রত্যেক পরীক্ষার সময় খোদা তাঁহাকে সাহায্য করেন। যখন তাঁহাকে যুলুম করিয়া আগুনে ফেলা হইল খোদা আগুনকে তাঁহার জন্য ঠাণ্ডা করিয়া দিলেন। যখন এক দুস্কৃতিকারী তাঁহার স্ত্রীর প্রতি অসৎ ইচ্ছা লালন করিল তখন খোদা তাঁহার হস্তদ্বয়ের উপর বিপদ অবতীর্ণ করিলেন যাহা দ্বারা সে তাহার ঘৃণ্য ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চাহিয়াছিল। অতঃপর যখন ইব্‌রাহীম খোদার নির্দেশে নিজ প্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে এইরূপ পাহাড়ী অঞ্চলে রাখিয়া আসিলেন যেখানে পানিও ছিল না এবং খাদ্যও ছিল না, তখন খোদা অদৃশ্য হইতে তাহার জন্য পানি ও খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। (ক্রমশঃ)

( হাকিকাতুল ওহী পুস্তকের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ )

## হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

# অমৃত বাণী

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভুঁইয়া

( ১৪ ও ১৫শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর )

দেখ, আমি খোদাতা'লার কসম খাইয়া বলিতেছি যে, আমার সত্যায়নে হাজার হাজার নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে ও ভবিষ্যতে হইতে থাকিবে। যদি ইহা মানুষের পরিকল্পনা হইত তবে তাঁহার এতখানি সাহায্য ও সমর্থন কখনো পাওয়া যাইত না। হাজার হাজার প্রকাশিত নিদর্শনের মধ্যে দুই একটি বিষয় লোকদিগকে ধোকা দেওয়ার জন্য এই বলিয়া পেশ করা যে, অমুক অমুক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই—ইহা ন্যায়-বিচার ও ঈমানের পরিপন্থী ; হে নির্বোধেরা, হে জ্ঞানান্ধরা, হে ন্যায়-বিচার ও বিশ্বস্ততা হইতে দূরে অবস্থান-কারীরা ! হাজার হাজার ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে যদি দুই একটি ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাপ্রাপ্তি তোমাদের বোধগম্য না হয়, তবে কি তোমরা এই অজুহাতে খোদাতা'লার নিকট নির্দোষ সাব্যস্ত হইয়া যাইবে ? * তওবা কর। খোদার দিন নিকটবর্তী। ঐ নিদর্শন প্রকাশিত হইবে, যাহা পৃথিবীকে প্রকম্পিত করিয়া দিবে।

ইহাতো খোদার নিদর্শন, যাহা আমি পেশ করিতেছি। কিন্তু তোমরা ভাবিয়া দেখ এই বিরুদ্ধাচরণের পক্ষে তোমাদের হাতে কী যুক্তি-প্রমাণ আছে ? তোমরা কেবলমাত্র এইরূপ হাদীসসমূহ পেশ করিয়া থাক, বাস্তব ঘটনাবলী যাহাদের বিরুদ্ধে ঘটিয়া চলিয়াছে। ঐ দাজ্জাল কোথায়, তোমরা যাহার ভয় দেখাইতেছ ? কিন্তু পথভ্রষ্টরা ও দাজ্জাল দিনের পর দিন পৃথিবীতে উন্নতি করিয়া চলিয়াছে। ইহাদের ফেতনায় আকাশ ও পৃথিবী বিস্ফারিত হওয়ার সময় নিকটবর্তী। অতএব যদি তোমাদের হৃদয়ে খোদা-ভীতি থাকিত তবে সূরা

---

* আজ পর্যন্ত আমার সমর্থনে খোদাতা'লার যে সকল নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে যদি ঐগুলিকে গণনা করা হয়, তবে ঐগুলির সংখ্যা তিন লক্ষেরও অধিক হইবে। যদি এই বিপুল সংখ্যক নিদর্শনের মধ্যে দুই তিনটি নিদর্শন কোন বিরুদ্ধবাদীর দৃষ্টিতে সন্দেহজনক হয় তবে উহা সম্পর্কে হৈ চৈ করা এবং বিপুল সংখ্যক নিদর্শন হইতে ফায়দা না উঠানোই কি এই সকল লোকের তাকওয়া ও নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের মধ্যে কি ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না ?

ফাতেহার উপর চিন্তা করাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হইত। ইহা কি সম্ভব নহে যে, তোমরা প্রতিশ্রুত মসীহের ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ যাহা বুঝিয়াছ তাহা সঠিক নহে? এই ধরনের ভুলের দৃষ্টান্ত ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে কি মওজুদ নাই? তাহা হইলে তোমরা কিভাবে ভুল হইতে বাঁচিতে পার? খোদার কি এই বিধান নাই যে, কখনো কখনো তিনি এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা স্বীয় বান্দাদের পরীক্ষাও গ্রহণ করিয়া থাকেন? দৃষ্টান্তস্বরূপ, তওরাত ও মালাকী নবীর ভবিষ্যদ্বাণীর দরুন এবং ইঞ্জিলের ভবিষ্যদ্বাণীর দরুন ইহুদী ও খৃষ্টানেরা পরীক্ষায় নিপতিত হইয়াছিল। অতএব, তাকওয়ার গণ্ডির বাহিরে পা রাখিও না। ইহুদী ও তাহাদের নবীগণের ধারণা অনুযায়ী আখেরী নবী কি বনী ইসরাঈলের মধ্য হইতে আসিয়াছেন, বা ইলিয়াস নবী কি পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন? কখনো নহে। বরং ইহুদীরা উভয় ক্ষেত্রেই ভ্রান্তিতে নিপতিত হইয়াছে। অতএব তোমরা ভয় কর। কেননা খোদাতা'লা তোমাদিগকে সূরা ফাতেহায় ভয় দেখান যে, এমন যেন না হয় যে, তোমরা ইহুদী হইয়া যাও। ইহুদীরাও তোমাদের দাবীর ন্যায় আল্লাহ্‌র কেতাবের বাহ্যিক অর্থের সহিত সম্পৃক্ত ছিল। কিন্তু বিচারকের কথা তাহারা মানিল না এবং তাঁহার নিদর্শনাবলী হইতে কোন ফায়দা উঠাইল না। অতএব তাহারা পাকড়াও হইল এবং তাহাদের কোন অজুহাত গ্রহণ করা হইল না।

এই বিষয়টিও স্মরণযোগ্য যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কেননা খোদাতা'লা দেখেন যে, সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত খৃষ্টান ও ইহুদীদের মধ্যে অনেক গোমরাহী সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। অতএব খোদাতা'লা উভয় জাতির জন্য আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে হাকিম রূপে প্রেরণ করেন। কিন্তু যিনি মুসলমানদের জন্য হাকিমরূপে নির্ধারিত ছিলেন তাঁহার আবির্ভাবের মেয়াদ প্রথম মেয়াদের তুলনায় বাড়াইয়া দেওয়া হইল, অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দী। ইহা এই কথার প্রতি ইঙ্গিত ছিল যে, খৃষ্টানেরা তো কেবল সপ্তম শতাব্দীতে পৌঁছিয়াই বিগড়াইয়া গেল। কিন্তু এই মেয়াদের দ্বিতীয় অংশে পৌঁছিয়া মুসলমানদের অবস্থার অবনতি ঘটিবে এবং চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে তাহাদের হাকিম আবির্ভূত হইবেন।

অতঃপর আমি আমার পূর্বের বর্ণনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লিখিতেছি। আমি বর্ণনা করিয়াছি যে, ওহীর তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে পরিপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ ওহী উহাই, যাহা জ্ঞানের তৃতীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। ইহার প্রাপক আল্লাহ্‌র জ্যোতিতে আপাদমস্তক নিমজ্জিত হইয়া যান এবং ইহা তৃতীয় পর্যায়ের 'হককুল একীন' (নিশ্চিত বিশ্বাস) নামে অভিহিত। ইতিপূর্বে আমি বর্ণনা করিয়াছি যে, প্রথম শ্রেণীর ওহী বা স্বপ্ন কেবল 'ইলমুল একীন' (জ্ঞানলব্ধ বিশ্বাস) পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এক ব্যক্তি অন্ধকার রাত্রিতে ধুঁয়া দেখিল এবং ইহাতে আনুমানিকভাবে যুক্তি দেয় যে, এই স্থানে আগুন থাকিবে। এই যুক্তি কখনো নিশ্চিত হয় না। কেননা উহা ধুঁয়ার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ। উহা ধুঁয়াও হইতে পারে। কিন্তু উহা

এইরূপ ভূমি হইতে নির্গত হইতেছে যেখানে কোন আগ্নেয় উপাদান মওজুদ আছে। সুতরাং এই জ্ঞান একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে তাহার অনুমান হইতে মুক্তি দিতে পারে না। বরং উহা কেবলমাত্র তাহার একটি ধারণা, যাহা তাহার নিজের মস্তিষ্কেই জন্ম নেয়। সুতরাং তাহার স্বপ্ন ও ইলহাম এই জ্ঞানের সীমায় আবদ্ধ। তাহাদের মস্তিষ্কের গঠনের দরুন তাহারা এই স্বপ্ন ও ইলহাম লাভ করে। তাহাদের মধ্যে কোন পুণ্য কর্মের অস্তিত্ব নাই। ইহাতো 'ইলমুল একীন' এর দৃষ্টান্ত। যে সকল ব্যক্তির স্বপ্ন ও ইলহামের উৎসমূল এই পর্যায়ের যে, তাহাদের হৃদয়ে সচরাচর শয়তানের প্রভাব থাকে। তাহাদিগকে বিপথগামী করার জন্য ঐ শয়তান কোন কোন সময় এইরূপ স্বপ্ন বা ইলহাম পেশ করিয়া থাকে। ইহার দরুন তাহারা নিজদিগকে জাতির নেতা বা রসূল বলিয়া থাকে আর পরিশেষে ধ্বংস হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ জম্মুর অধিবাসী হতভাগ্য চেরাগ দীনের কথা বলা যাইতে পারে। সে পূর্বে আমার জামা'তের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহার নিকট শয়তানী ইলহাম হইল যে, সে রসূল ও প্রেরিত পুরুষগণের অন্তর্ভুক্ত এবং দাজ্জাল হত্যা করার জন্য হযরত ঈসা তাহাকে একটি লাঠি দিয়াছেন। সে আমাকে দাজ্জাল সাব্যস্ত করিল। এই কারণেই সে ধ্বংস হইয়াছিল। অবশেষে ঐ ভবিষ্যদ্বাণী যাহা 'দাফেউল বালা মেয়ারে আহালেল ইস্তেফারে' নামক পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ আছে, তদনুযায়ী সে প্লেগে তাহার উভয় ছেলে সহ যৌবনে মারা গেল। মৃত্যুর নিকটবর্তী দিনগুলিতে সে মোবাহালা স্বরূপ এই প্রবন্ধ আমার নাম লইয়া প্রকাশ করিয়াছিল যে, আমাদের উভয়ের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী খোদা তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিবেন। অতএব, সে নিজেই ১৯০৬ সালের ৪ঠা এপ্রিলে নিজের উভয় ছেলেসহ প্লেগে ধ্বংস হইয়া গেল! فاتقوا الله يا معشر الملهمين (অর্থ: হে ইলহাম প্রাপ্তদের দল, তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর—অনুবাদক)।

দ্বিতীয় অবস্থা ইহা, যেমন মানুষ অন্ধকার রাত্রিতে এবং প্রচণ্ড শীতের সময় দূর হইতে একটি আলো দেখিতে পায়। যদিও ঐ আলো তাহাকে চলার পথ দেখিতে সাহায্য করে, কিন্তু তাহার শীত দূর করিতে পারে না। এই পর্যায়ের নাম 'আয়নুল একীন'। এই পর্যায়ের তত্ত্বজ্ঞানী খোদাতা'লার সহিত সম্পর্ক তো রাখেন, কিন্তু ঐ সম্পর্ক পরিপূর্ণ হয় না। এই পর্যায়ে শয়তানী ইলহাম প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। কেননা তখনো এইরূপ ব্যক্তির সহিত শয়তানের যে পরিমাণ সম্পর্ক থাকে, সেই পরিমাণ সম্পর্ক খোদাতা'লার সহিত থাকে না।

তৃতীয় অবস্থা উহা, যখন মানুষ অন্ধকার রাত্রিতে এবং প্রচণ্ড শীতের সময় কেবল আগুনের আলোই পায় না, বরং সে ঐ আগুনের মধ্যে প্রবেশ করে এবং অনুভব করে যে, প্রকৃতপক্ষে আগুন ইহাই এবং সে ইহা দ্বারা নিজের শীত দূর করে। ইহা ঐ পরিপূর্ণ স্তর, যাহার সহিত ধারণার কোন তুলনা হইতে পারে না। ইহাই ঐ স্তর, যাহা মানবীয় শীত ও

দুর্বলতাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করে। এই অবস্থার নাম 'হক্কুল একীন' (অভিজ্ঞতালব্ধ নিশ্চিত বিশ্বাস)। এই মর্যাদা কেবলমাত্র কামেল ব্যক্তিগণ লাভ করেন, যাঁহারা আল্লাহ্‌র জ্যোতি-বিকাশের গণ্ডিতে প্রবেশ করেন। তাঁহাদের জ্ঞানের ও ধর্মের উভয় অবস্থাই সঠিক হইয়া যায়। এই স্তরে পৌঁছার পূর্বে না জ্ঞানের অবস্থা পরিপূর্ণতায় পৌঁছায়, না কর্মের অবস্থা পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই স্তরে যাঁহারা পৌঁছেন, তাঁহারা ঐ সকল ব্যক্তি যাঁহারা খোদাতা'লার সহিত পরিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং প্রকৃতপক্ষে 'ওহী' শব্দটি ইহাদের ওহী সম্পর্কে প্রযোজ্য। কেননা তাঁহারা শয়তানী প্রভাব হইতে পবিত্র। তাঁহারা ধারণার স্তরে অবস্থিত নহেন। বরং তাঁহারা নিশ্চিত বিশ্বাসের স্তরে অবস্থিত। তাঁহারা হইলেন জ্যোতিঃ। ইহা তাঁহারা খোদাতা'লার পক্ষ হইতে লাভ করেন। হাজার হাজার আশীষ তাঁহাদের সঙ্গে থাকে এবং তাঁহারা সঠিক দৃষ্টি লাভ করেন। কেননা তাঁহারা দূর হইতে দেখেন না; বরং তাঁহাদিগকে জ্যোতির গণ্ডিতে প্রবিষ্ট করানো হয়। খোদার সহিত তাঁহাদের হৃদয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই জন্যই যেভাবে খোদাতা'লা নিজের জন্য ইহা চাহেন যে, তাঁহাদিগকে সনাক্ত করা হউক, তদ্রূপেই তাঁহাদের জন্যও ইহাই চাহেন যে, তাঁহার বান্দারা তাঁহাদিগকে সনাক্ত করুক। অতএব এই উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের সাহায্য ও সমর্থনে তিনি বড় বড় নিদর্শন প্রকাশ করেন। যে ব্যক্তিই তাঁহাদের মোকাবেলা করে সে-ই ধ্বংস হয়। যে ব্যক্তিই তাঁহাদের সহিত শত্রুতা করে পরিণামে তাহাকে মাটিতে মিশাইয়া দেওয়া হয়। খোদা তাঁহাদের সকল কথায় সকল কাজে তাঁহাদের বস্ত্রে এবং গৃহে আশীষ দান করেন। তিনি তাঁহাদের বন্ধুদের বন্ধু এবং শত্রুদের শত্রু হইয়া যান এবং পৃথিবী ও আকাশকে তাহাদের সেবায় নিয়োজিত করেন। যেভাবে পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, এই সৃষ্টির একজন খোদা আছেন, তদ্রূপেই খোদা তাহাদের জন্য যে সকল সাহায্য, সমর্থন ও নিদর্শনাদি প্রকাশ করেন ঐগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মানিতে হয় যে, তাঁহারা খোদার গৃহীত ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহাদিগকে এই সকল সমর্থন, সাহায্য ও নিদর্শনের মাধ্যমে সনাক্ত করা হয়। কেননা এইগুলি এত বিপুল সংখ্যায় সুস্পষ্টভাবে হইয়া থাকে যে, ইহাতে অন্য কেহ তাঁহাদের অংশীদার হইতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত যেভাবে খোদাতা'লা তাঁহার সৃষ্টি-গুণের দ্বারা মানুষের হৃদয়ে স্বীয় প্রেম প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, তদ্রূপেই তাঁহাদের সৃষ্টি-গুণে এইরূপ অলৌকিক প্রভাব রাখিয়া দেন যে, মানুষের হৃদয় তাঁহাদের দিকে আকৃষ্ট হইয়া যায়। তাঁহারা এক অদ্ভুত জাতি। মৃত্যুর পর তাঁহারা জীবিত হন এবং হারানোর পর পাইয়া থাকেন। তাঁহারা এত পরাক্রমে সততা ও বিশ্বস্ততার পথে চলেন যে, তাহাদের সহিত খোদা এক পৃথক আচরণ করিয়া

(অবশিষ্টাংশ ৫-এর পাতায় দেখুন)

# জুমুআর খুতবা

## হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[ ৭ই আগষ্ট, ১৯৯২ তারিখ লণ্ডনের মসজিদে ফযলে প্রদত্ত ]

অনুবাদ : মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক,
সদর মুরুব্বী

তাশাহ্হুদ ও তা'আওউয এবং সূরা ফাতেহা তেলাওয়াতের পর হুযুর এই আয়াত দু'টি পাঠ করেন :

ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا ٥

والذين لايشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما ٥ ( الفرقان ٧٢-٧٣ )

এর পর হুযুর আনওয়ারুল্লাহুল ওয়াহুদ বলেন,

কয়েকটি খুতবার পূর্বে 'তাবাত্তোল ইলাল্লাহ' ( দুনিয়ার আকর্ষণ ও মায়া-মোহ ত্যাগ করে আল্লাহর প্রতি অনুরক্ত হওয়া )-এর বিষয় ব্যক্ত হচ্ছিল এবং আমি বলেছিলাম যে, তাবাত্তোল ইলাল্লাহর সঙ্গে তৌহীদের প্রগাঢ় সম্পর্ক আছে। কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত তৌহীদবাদী হতে পারে না এবং এক খোদার প্রকৃত ইবাদতগুযার বলে অভিহিত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে 'লা ইলাহা'র বিষয়টি উপলব্ধি করে প্রত্যেক মিথ্যা খোদাকে অস্বীকার করবে। তখনই সে খোদার তৌহীদের রঙ্গে রঙ্গীন হয় নচেৎ মানুষ কেবল কাল্পনিকভাবে তৌহীদবাদী বলে অভিহিত হয়; প্রকৃতপক্ষে সে তৌহীদের তত্ত্বজ্ঞান ও উহার স্বরূপ সম্বন্ধে অপরিপক্ক থাকে। তৌহীদের বিষয়টিই এমন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে তার দৈনন্দিন জীবনে ইহার গভীর সম্পর্ক আছে, তাই কেবল দার্শনিক বিবরণ যথেষ্ট নয়; কারণ মানুষ বিভিন্ন প্রকারের। একজন মেধাবী এবং শিক্ষিত ব্যক্তি সহজে একটি কথা বুঝে ফেলে কিন্তু একজন সাধারণ ব্যক্তি তা সহজে বুঝতে পারে না। তাই কুরআনের তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ঐগুলির আস্বাদ অনুভব করার জন্য প্রকৃতির পবিত্রতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার প্রয়োজন রয়েছে, যেগুলিকে সাধারণতঃ সরল প্রাণ লোক বুঝতে পারে না বা আল্লাহ্তা'লা কর্তৃক তাদিগকে সে রকম যোগ্যতা প্রদত্ত হয় না যে, তারা সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু কুরআন করীম এমন এক কিতাব যা সকল শ্রেণীর লোকের জন্যই প্রদত্ত রয়েছে যাতে ছোটদের জন্যও এবং বড়দের জন্যও অতি সূক্ষ্ম বিষয়াবলীও রয়েছে যা উপলব্ধি করার জন্য অনেক উচ্চাঙ্গের চিন্তাধারা ও বুদ্ধি-বিবেকের প্রয়োজন, এইরূপে সাদামাটা বিষয়াবলীও রয়েছে। এইজন্যই এই কিতাবকে গুপ্ত কিতাবও বলা হয়েছে এবং উন্মুক্ত

কিতাবও বলা হয়েছে; ঠিক এই একই অবস্থা হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর গুণাবলীরও যে, একজন একেবারে সাদামাটা অশিক্ষিত ব্যক্তিও, সে যে কোন ভূখণ্ডের সহিত সম্পর্ক রাখুক না কেন, সে তাঁর গুণাবলীর বিষয়ে এই পর্যায়ে ওয়াকেফহাল হতে পারে যে, তার অন্তর স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর ভালবাসায় বিভোর হয়ে আন্দোলিত হতে থাকে কিন্তু এই কথা বলা যে, আমি হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) গুণাবলীকে পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে আয়ত্তাধীন করে ফেলেছি এবং পূর্ণজ্ঞানের ভিত্তিতে আমি তাঁর প্রতি আশেক হয়ে গিয়েছি, এইরূপ বলা বড়ই অহংকারের কথা হবে, তবে ঐ ব্যক্তি ব্যতিরেকে যাকে আল্লাহতা'লা প্রকৃত ও নিশ্চিত জ্ঞান দান করেন।

হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ) যে চক্ষু দ্বারা হুযূর আকরাম (সাঃ)-কে দেখেছেন সেই চক্ষুকে এমন নূর প্রদান করা হয়েছিল যে নূর হুযূর আকরাম (সাঃ)-এর নূরের অতি পূত পবিত্র সূক্ষ্মতাকে সনাক্ত করতে পারতো। এইজন্য কুরআনের ন্যায় হযরত আকদস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক উন্মুক্ত কিতাবও বটেন এবং এক গুপ্ত কিতাবও বটেন। অতএব যখন তৌহীদের বিষয় ব্যক্ত করা হয় তখন ইহার পরম গভীর তত্ত্বজ্ঞান ব্যক্ত করারও প্রয়োজন রয়েছে এবং এমন সরল ও প্রকাশ্য বিষয়াবলীও ব্যক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে যেগুলি প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষ উপলব্ধি করতে পারে এবং তারা সেই সব বিষয়াবলীর জ্ঞান আহরণ করে উপকৃত হতে পারে। অতএব আমি আজকের খুতবার জন্য এই বিষয়কে চয়ন করেছি যে কোন্ কোন্ বিষয়াবলী আছে যেগুলি হতে বিমুখ হয়ে আল্লাহ্র প্রতি অনুরক্ত হতে হয় এবং তৌহীদের দিকে যাত্রাভিযান চালানোর জন্য কোন্ কোন্ বিষয়াবলীকে বর্জন করতে হয় সেইগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রথম হল মিথ্যাচরণ যা সকল অনিষ্টের মূল ও সর্বাধিক পাপ, যা কুরআনের ভাষায় শির্কের অন্তর্গত এবং যাকে মল ও অপবিত্র বস্তু বলা হয়েছে। এটা এমন পাপ যাকে সত্যবাদীরাও অজ্ঞাতসারে অবলম্বন করতে থাকে যা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দৃষ্টিসহ গভীরে নামতে হয়। অতএব আজকে আমি এই বিষয়টি বুঝাতে ইনশাআল্লাহতা'লা পূর্ণ চেষ্টা করবো। যদি আজকে বিষয়টি শেষ না হয় তাহলে পরবর্তী খুতবায় ইহাকে জারি রাখবো।

কুরআন মুমেনের এই শান ব্যক্ত করেছে—ওয়া মান তাবা ওয়া আমেলা সালেহান ফা ইন্নাহু ইয়াতুবু ইলাল্লাহে মাতাবা—যে ব্যক্তিই তওবা করে এবং পুণ্য কর্ম করে বস্তুতঃ সে তওবা করতঃ আল্লাহ্র দিকে দ্রুত ঝুঁকে পড়ে; এটা সেই তাবাত্তোলেরই বিষয়বস্তু যা এস্থলে অন্য শব্দে ব্যক্ত হয়েছে।

তাবত্তোল ইলাল্লাহ্র মর্ম আল্লাহ্ ভিন্ন সকলকে পরিহার করে খোদার দিকে ধাবিত হওয়া। আর ইয়াতুবু ইলাল্লাহে মাতাবা এর অর্থও ঠিক ঐরূপই। শুধু অন্য শব্দে এই বিষয়টিকে অবস্থা ও ক্ষেত্র অনুযায়ী ব্যক্ত করা হয়েছে। ইহার ব্যাখ্যা পরবর্তী আয়াতে

এসেছে, আল্লাহ্‌র দিকে দ্রুত ঝুঁকে পড়া কাকে বলা হয়। ওল্লাযীনা লা ইয়াশহাদূনায্‌যুরা—ইহা ঐ সকল লোকের ভাগ্যে জুটে যারা মিথ্যাকে দেখতেও পারে না। লা ইয়াশহাদূনায্‌যুরা এর এক অর্থ এই যে, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না; আর এক অর্থ এই যে, উহাতে দৃষ্টিপাতও করে না; এত গর্হিত মনে করে যে, উহা হতে দূরে সরে পড়ে; এই বিষয়টিরই ব্যাখ্যা পরে ব্যক্ত হয়েছে যে, ওয়া ইযামার্‌রু বেল্লাগবি মার্‌রু কেরামান—মিথ্যার নিম্নতম প্রকারকেও তারা বর্জন করে। বৃথা কথাবার্তাও মিথ্যারই এক প্রকার বিশেষ; কিন্তু খুবই সাধারণ প্রকার। যখন তারা বৃথা কথাবার্তার মজলিস দেখে তখন তারা উহাতে কোন কৌতূহল বোধ করে না। মার্‌রু কেরামান—সম্মানের সহিত নিজেদের অস্তিত্বকে রক্ষা করে সেখান থেকে পাশ কেটে চলে যায়। এইসকল লোকই প্রকৃত তওবাকারী লোক যারা দ্রুত আল্লাহ্‌র দিকে দৌড়াতে থাকে। সুতরাং মিথ্যাচরণ হতে নিজেকে রক্ষা করা হচ্ছে প্রথম মৌলিক বিষয়; 'তাবাত্তোল' ইহা ব্যতিরেকে সম্ভবই নহে। আপনি খোদার খাতিরে অন্যান্য সব বিষয় বিসর্জন করে দিলেন কিন্তু মিথ্যাচরণ হতে নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করলেন না তাহলে সূক্ষ্ম পরিভাষায় আপনি মুশরেকই হবেন এবং 'লা ইলাহা'—এর প্রথম স্তরও আপনি অতিক্রম করতে পারলেন না যার সাথে ইল্লাল্লাহু—সংযুক্ত হয়ে থাকে।

এই প্রসঙ্গে মিথ্যার অনেক অবস্থা এবং প্রকার রয়েছে সেই সম্পর্কে সংক্ষেপে আমি আপনাদের সম্মুখে এক একটি দিক বর্ণনা করবো। কোন কোন ব্যক্তি এমন যে, সে দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে অর্থাৎ প্রতিদিনই মিথ্যা বলার অভ্যাস এমন গাঢ় হয়ে গেছে যে, সে অনুভবই করে না যে, সে মিথ্যা কথা বলছে; সত্য কথা খুব কমই তার মুখ থেকে বের হয়। সাধারণ কথাবার্তায় বৃথা বলা মিথ্যা বলা জীবনের এক দৈনন্দিনের অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যক্তি এমন যে গাফিলতির মধ্যে কালাতিপাত করে। এমন ব্যক্তিকে মিথ্যার পাঁক থেকে উদ্ধার করা সব চাইতে কঠিন সমস্যা। যে সকল মন্দ বিষয়ে অভ্যাস বদ্ধমূল হয়ে যায় সেইগুলি বিষয় হতে তার দৃষ্টি উদাসীন ও গাফিল হয়ে পড়ে। এমন কি যখন ব্যাধিসমূহ দীর্ঘায়ু হয়ে যায় তখন মানবিক দেহে ব্যাধিসমূহ থাকা সত্ত্বেও সেইগুলি সম্বন্ধে উদাসীন ও গাফেল হয়ে যায়। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) কাদিয়ানের এক সরল-প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করতেন। সে বাল্যকাল হতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, জ্ঞাতসারে নহে, অজ্ঞাতসারে অত্যধিক গালাগালি করতো। একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ) তাকে নিকটে ডেকে বললেন, দেখ! আমাকে বলা হয়েছে, তুমি নাকি অনেক গালাগালি কর। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি যেমন একজন ভাল মানুষ তেমনই জিহ্বাটাকে ভাল রাখো এবং পরিষ্কার রাখো; তখন সে ঐ মিথ্যুককে অনেক গালাগালি করলো যে, এই মিথ্যাকে তার প্রতি আরোপ করছিল; সে বললো, ঐ মিথ্যুক বড়ই বদবখ্‌ত, বদনসীব, এমন আর তেমন, সে অমুক

আর অমুক সে মিথ্যা কথা বলছে যে, আমি গালাগালি করি। আপনাকে কোন দুষ্ট ব্যক্তিই এই সংবাদ দিয়েছে। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ) বুঝে ফেল্লেন। তিনি বল্লেন, ঠিক আছে, তোমার কোন দোষ নেই, তুমি এইসব হতে অনেক উর্ধ্বে। আসলে কোন কোন অভ্যাস মানুষকে এমনভাবে আয়ত্তাধীন করে ফেলে যে, তার দৃষ্টি হতে ঐগুলি অন্তরালে চলে যায়; যে অভ্যাসগুলি সে পোষে যেগুলি তার ভিতর হতে জন্ম নেয়। অতএব মিথ্যা যদি এইরূপ অবস্থা ধারণ করে তাহলে এটা হয় ভয়াবহ ব্যাধি যা হতে কাউকে বের করা বড়ই কঠিন বিষয়।

আমিও আমার দৈনন্দিনের অভিজ্ঞতার আলোতে দেখেছি, অনেক পক্ষ এমন আছে যারা অপর পক্ষের সঙ্গে বিভেদ রাখে, তাদের বিবাদ বাধে, তখন লক্ষ্য করেছি যে, যাদের মধ্যে মিথ্যার অভ্যাস থাকে তাদিগকে ইহা বুঝানো কঠিন হয়ে যায় যে, তারা মিথ্যা বলছে। আর কেহ কেহ তো মিথ্যা বলায় এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে যায়, যদি তাকে বলা হয় যে, তুমি মিথ্যা বলছো তখন সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং বলে, তোমরা যা ইচ্ছা তাই বলো কিন্তু ভবিষ্যতে আমাকে মিথ্যুক বলবে না, আমি এইটা সহ্য করতে পারি না। এই যে মিথ্যা, এইটা এখন আমাদের জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। আপনারা আপনাদের দেশে গিয়ে দেখেন, দেখবেন যে, রাজনীতিতে মিথ্যা, ব্যবসায় মিথ্যা আদালতে মিথ্যা। জীবনের এমন কোন দিক নেই যেখানে মিথ্যা প্রচলিত নেই। দৈনন্দিনের সম্পর্কে মিথ্যা পরস্পর ভালবাসার আলাপ আলোচনায় মিথ্যা প্রত্যেক কথা বানাওট এবং মিথ্যার উপর রচিত। আর এই কারণেই জাতি বুঝতে পারছে না, আমরা কত ব্যাধিগ্রস্ত। কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তা'লা ইরশাদ করেছেন, যদি তোমরা মিথ্যা পরিহার না কর তা হলে তোমাদের তওবাই গৃহীত হবে না। সত্যিকার ও গৃহীত তওবাকারী সেই ব্যক্তি যে মিথ্যার দ্বিতীয় পর্যায়ও ছেড়ে দেয়, ইহার তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায় ছেড়ে দেয় এমন কি বৃথা কথাবার্তা যা প্রত্যক্ষভাবে মিথ্যার অন্তর্গত নহে তবে মিথ্যার এক প্রকার বটে সে ঐগুলিকেও বর্জন করে। আর বৃথা মজলিস দেখলে মুখ ফিরিয়ে সসম্মানে নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করে সেখান থেকে প্রস্থান করে। অতএব এক তো হলো এই মিথ্যা; আর দ্বিতীয় মিথ্যাটি হলো এইরূপ, যখন কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয় তখন বলা হয়।

এই প্রকারের মিথ্যায় কোন সময় লোভে পড়েও মানুষ মিথ্যায় লিপ্ত হয়; আবার কোন সময় ভয়েও লিপ্ত হয়। ইহা সেই বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ পরিপন্থী যা ইয়াদউনা রাব্বাহুম খুফান ওয়া তামআন-এর মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে যে, মোমেন সেইসব লোক যারা ভয়ের মধ্যেও নিজেদের প্রভুকে ডাকে এবং কোন জিনিস পাওয়ার লোভ হলেও তারা নিজেদের প্রভুকে ডাকে। ইহা পরিচয়ের উত্তম উপায় এবং অকাট্য উপায় যে, তৌহীদে প্রতিষ্ঠিত কে এবং তৌহীদ হতে বিচ্যুত কে? একজন তৌহীদবাদীর শান ও বৈশিষ্ট্য এই যে, লোভ-লালসার অবস্থায়ও সর্বপ্রথমেই তার মন খোদার দিকে চলে যায় এবং যতই কাম্য ও

কাঙ্খিত বস্তু হউক না কেন যদি উহা খোদা ছাড়া অন্য কারো দরজা হতে পেতে হয় তা হলে সে সেই জিনিস হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ভয়ের সময় সৃষ্টি হলেও সে সর্বপ্রথমেই খোদার দরবারে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু ভয়ের সময় যদি কারো অন্তরে এই চিন্তা-ভাবনার উদ্ভব ঘটে যে, এই বিপদ থেকে কিরূপে রক্ষা পেতে পারি, কি কি মিথ্যা বাহানা করতে পারি, কি কি ষড়যন্ত্র করতে পারি, কার কার লাগাম ধরবো, কার কার দ্বারা সুপারিশ করাবো? এইসবই শির্‌ক জাতীয় পদ্ধতি যার সঙ্গে তৌহীদের কোন সম্পর্ক নেই। এই বিষয়টির প্রতিও লক্ষ্য করে দেখুন যে, কিরূপে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে তাদের সমাজে এই মিথ্যাটি পূর্ণ বিস্তার লাভ করেছে। এই প্রকারের মিথ্যায় ছোট বড় ভাল মন্দ সকলেই লিপ্ত রয়েছে বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এমন কি কোন কোন আহ্‌মদী যুবকের বিষয়ে ইহা শুনে বড়ই কষ্ট হয় যে, দৈনন্দিন জীবনে তারা সত্য কথা বলে বটে কিন্তু যদি কখনও তাদের স্বার্থের প্রশ্ন উঠে, তা রাজনৈতিক আশ্রয় নেওয়ার বিষয়ই হউক বা কোন বিপদ আপদ ও পাপ হইতে উদ্ধার পাওয়ার বিষয়ই হউক, তখন মাথায় মিথ্যা চিন্তার আবির্ভাব ঘটে যে, ঠিক আছে আমরা এইরূপ করি যে, পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলি এবং গিয়ে বলি যে, পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে, আর বলে দেই যে, আমরা জার্মানী থেকে আসি নি আমরা তো সোজা পাকিস্তান থেকে এসেছি। যদি জার্মানী থেকে এসে থাকে তাহলে অপর দেশের কর্তৃপক্ষ বলবে, তোমরা প্রথমে জার্মানীতে গিয়েছিলে তাহলে এটা তাদের কাজ যে, তোমাদিগকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিবে, বা দিবে না; এখন আমাদের নিকট কিসের জন্য এসেছ? অথবা ইংল্যাণ্ডে আসলো বা অন্য কোন দেশে পৌঁছলো এবং গিয়ে বলে দিল যে, আমরা তো সোজা পাকিস্তান থেকে এসেছি। এই সব বিষয়ই মিথ্যার অন্তর্গত এবং খোদা ছাড়া অন্য কাকেও প্রভু স্থির করার শামিল। সুতরাং আল্লাহ্‌তা'লা যখন কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেন, ইন্নাল্লাযীনা কালু রাব্বুনাল্লাহু সুম্মাসতাকামু তাতানাযযালু আলায়হিমুল মালায়কাতু আল্লাতাখাফু ওলা তাহ্‌যানু (হামীম সিজদা: ৩১) অর্থাৎ ঐ সকল লোক যারা খোদাকে প্রভু বলে অতঃপর অবিচল থাকে অন্য কোন প্রভুর প্রতি ঝুঁকে না তারাই এমন লোক যাদের উপর ফিরিশ্‌তা নাযেল হয় এবং বলে যে, তোমরা ভয় করো না এবং দুঃখিত ও চিন্তিত হইও না তোমরা ঠিক লাগামই ধরেছ, তিনিই প্রভু এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু তিনিই তোমাদের লালন পালনের সকল ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু কোন ব্যক্তি যখন খোদাকে ছেড়ে মিথ্যার লাগাম ধরে তখন কার্যতঃ সে এই কথাই বলে যে, আমাদের প্রভু হচ্ছে মিথ্যা এবং এই মিথ্যা প্রভুর বদৌলতে আমরা আমাদের সকল সমস্যা হতে মুক্তি পাব ও তখন তার পথ পৃথক এবং খোদার পথ পৃথক। অতঃপর যদি সে বিপদাবলীর মধ্যে পরিবেষ্টিত হয় তা হলে সেই বিপদাবলী তার জন্য পরীক্ষাই নহে বরং ঐগুলি হয় তার জন্য ধ্বংসের বিপদাবলী। যদি তাকে রিযিক প্রদানই করা হয় তাহলে উহা তার জন্য হয় ঘৃণ্য-গর্হিত বস্তু যা তাকেও ঘৃণ্য ও গর্হিত বানিয়ে ছাড়ে। শয়তানের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন হয়, খোদার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকে না।

অতএব কেন তোমরা নিজেদের জীবনকে ধ্বংস করছো। এক স্থানে একটি মিথ্যা সেজদা করার ফলে অনেক সময় মানুষ চিরজীবনের জন্য তৌহীদ হতে বঞ্চিত হয়ে যায়। সুতরাং মিথ্যার ইবাদত করা অত্যধিক ভয়াবহ শির্‌ক; পদে পদে ইহা হতে রক্ষা পাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে এবং বিশেষভাবে যখন অগ্নি পরীক্ষার দ্বারসমূহ সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকে যেগুলিকে চাবি দিয়ে খুলেও আপনি অতিক্রম করতে পারেন এবং ভেঙ্গেও অতিক্রম করতে পারেন। সেই সময় আপনি যদি তৌহীদের লাগাম ধরেন তাহলে আল্লাহ্‌তা'লা আপনাকে সেই চাবি দান করেন যদ্দারা আপনার সমস্যাবলীর সকল দ্বার খুলে যাবে। আর যদি আপনি মিথ্যার লাগাম ধরেন তাহলে সেই দ্বারগুলি ভেঙ্গে আপনি যে জান্নাতে প্রবেশ করতে চান সেই জান্নাতের পরিবর্তে সেই দ্বারই আপনাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। তাই প্রয়োজনের সময়ই মানুষের পরীক্ষা হয়ে থাকে, আর ইহার নামই ইস্তিকামাত (অবিচলন, স্থিতি)। সাধারণ অবস্থায় সত্য কথা বলার সঙ্গে ইস্তেকামাতের কোন সম্পর্ক নেই।

সত্যতা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির অংশবিশেষ। সত্যতা ব্যতিরেকে মানুষ প্রকৃতির চাহিদা পূরণ করতে পারে না। আমি পূর্বেও একবার এই বিষয়টি বুঝিয়েছিলাম যে, পশুর জগতে সত্যতাই সত্যতা; কোন পশু মিথ্যা কথা বলে না। পশুর মিথ্যা না বলার অর্থ এই যে, তাদের ভাবভঙ্গি তাদের চাল চলন, তাদের প্রতিক্রিয়া দ্বারা আপনি অনুমান করতে পারবেন যে, এই নিরীহ জীবের মধ্যে কোন মিথ্যাচরণ নেই। কেবল মানুষই এমন যে মিথ্যা শিখেছে। কেবল মানুষই এমন যাকে বিশেষভাবে হেদায়াত প্রদান করা হয়েছে যেন সে মিথ্যাকে পরিহার করে। অতএব মানুষ যখন মিথ্যা কথা বলে তখন তার উদ্দেশ্য ইহা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না যে, সে অন্য কাউকে প্রভু বলে বিশ্বাস করে অন্য কাউকে রক্ষাকারী বিশ্বাস করে বলেই সে মিথ্যা কথা বলে। আর এই যে নিয়্যতের ফয়সালা, ইহাকে সে চিনে না, সে ইহাকে চালাকি মনে করে, এবং বলে যে, বেশ হয়েছে, আমি তার সঙ্গে এমন চালাকি করেছি, তাকে বুঝতেই দেইনি যে, আমি কোথা থেকে এসেছি; কিন্তু সে এটা ভুলে গেছে যে, এ চালাকির মধ্যে সে খোদার পথ ছেড়ে দিয়েছে। এটা আশ্চর্য নির্বোধদের চালাকি যে, সে এমন এক লক্ষ্যস্থল অর্জন করেছে যা অস্থায়ী, ভুয়া, নিরর্থক; অপরদিকে সে এক চিরস্থায়ী লক্ষ্যস্থলকে বিসর্জন দিয়েছে।

অতএব প্রত্যেক এমন অগ্নি পরীক্ষা যাতে মানুষের সত্যতার পরীক্ষার প্রশ্ন উঠে উহাতে সকল বিরূপ অবস্থায় সত্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ়পদ থাকার নাম তৌহীদ এবং ইহা 'তাবাত্তোলে'রই এক প্রকার বিশেষ। সুতরাং আমরা যখন বলি, 'তাবাত্তোল' অবলম্বন কর এবং আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও, তখন উহার অর্থ ইহাই যে, প্রত্যেক এমন বস্তুকে পরিহার কর যা খোদা হতে মানুষকে দূরে সরিয়ে নেয়। এখন দেখ, কুরআন কত সরল সহজ এবং

পরিষ্কারভাবে এই বিষয়টিকে ব্যক্ত করেছে ; ইহাতে কোন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দর্শন জ্ঞান ব্যক্ত হয় নি। মান তাবা ওয়া আমেলা সালেহান—যে তওবা করতে চায় এবং তওবা করে এবং পুণ্য কর্ম করে ফাইন্নাহু ইয়াতুবু ইলাল্লাহে মাতাবা—তার জন্য ইহা ছাড়া কোন উপায় নেই যে, আল্লাহ্‌র দিকে পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ুক। অতএব কুরআন তাবাত্তোলের কত সুন্দর পরিষ্কার অর্থ খুলে বর্ণনা করেছে যে, মিথ্যা কথা বলিও না, তওবা করতে হলে মিথ্যার সাথে জীবন যাত্রা করা যাবে না, মিথ্যার তুচ্ছ হতে তুচ্ছতর বস্তুকেও পরিহার কর।

যেখানে তুচ্ছ বস্তুসমূহের মধ্যে বৃথা কাজকে মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে আমরা বাহ্যতঃ জিনিষটি দেখতে পাই সেটা গল্পগুজব। সাধারণতঃ লোক মনে করে, গল্পগুজবের মধ্যে গপ্প করলে মিথ্যা বলে গণ্য হয় না। বস্তুতঃ গল্পগুজবের মজলিসে গপ্প খুব বেশী চলে। কোন কোন সময় লোক একে অপরের বেশী গপ্প করার প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে দেয় ; কারণ প্রত্যেকেই এর মাধ্যমে জনপ্রিয় হতে চায়। কেহ কেহ যখন কোন ঘটনা শুনাতে গিয়ে দেখে যে, ঘটনাটিতে তো মজার বিষয় কিছু নেই তখন সে ঘটনার মধ্যে মজা ও রুচী বৃদ্ধির জন্য নিজের তরফ থেকে কিছু লবণ মরিচ লাগানো জরুরী মনে করে। বাহ্যদৃষ্টিতে এটাকে ব্যক্তিগত লাভের জন্য মনে করা হয় না। সে মনে করে, এটা কোন মিথ্যার অন্তর্গত নয়। এটা তো আমি মজলিসের মন যোগানোর জন্য করেছি। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে ইহাতে ব্যক্তিগত লাভের প্রয়াসই কাজ করেছে বলে বুঝা যায়। যখন কোন ব্যক্তি এমন কথা বলে যদ্বারা মজলিসে স্বাদ ও রস সৃষ্টি না হয় তখন সে ভিতরে ভিতরে অসুবিধা বোধ করে এবং মনে করে যে, তার কোন অভাব বিস্তৃত হল না ; আমি মজলিসের মন জয় করতে পারলাম না ; এই জন্য সত্য কথা বলে যদি না পারা যায় তাহলে মিথ্যা কথা বলেই মন জয় করতে হবে ; তখন সে ভুল কথাবার্তা সংযোজন করতে আরম্ভ করে। লোক যে নিজেদের পিতৃপুরুষদের সম্বন্ধে কথাবার্তা বলে তারও উদ্দেশ্য ইহা যে, তাদের গর্ব যেন উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের দিকে স্থানান্তরিত হয়। মোট কথা, প্রত্যেক মিথ্যা কথার পিছনে কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকে ; উদ্দেশ্য ছাড়া কেহ মিথ্যা কথা বলে না। বস্তুতঃ বৃথা কথাবার্তার মধ্যে মিথ্যার আমেজ থাকে এবং ঐগুলির মধ্যে ব্যক্তিগত লাভের আবেগ কার্যরত থাকে এবং চালাকির ব্যাপারে লোক পরস্পর প্রতিযোগিতা করার চেষ্টা করে এবং লোকের মধ্যে নিজেকে বেশী বুদ্ধিমান ও বেশী চালাক প্রমাণ করতে চায়।

বাহানা করাও মিথ্যারই এক প্রকার বিশেষ। ইহাও দৈনন্দিন জীবনে দেখা যায়। অনেকেই যারা অবশ্য সত্য কথা বলে থাকে, নিজে অনুভবও করে না যে, আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া কিরূপ হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি যখন এমন চাল চলনে ধরা পড়ে যার ফলে তাকে

লজ্জিত হতে হয়, তখন তার মন তৎক্ষণাৎ এক বাহানা তালাশ করে নেয় যে, এটা বলে দাও, এইরূপে ইহার ব্যখ্যা দিয়ে দাও ; একটা ভুল হয়ে গেছে, ভুলটা নিছক সাধারণ ভুল, এর কোন শাস্তি হবে না ; কিন্তু মানুষের অন্তর নিজ সম্মান রক্ষায় এমন প্রয়াসী যে, মিথ্যা বাহানা এঁটেও যদি সম্মান রক্ষা করতে হয় তাহলেও অবশ্য তা করে। যেমন একটি ভুল হল সঙ্গে সঙ্গে মন একটি বাহানা তালাশ করে নিল। মানুষের মন এতই বাহানা প্রিয় যে, যদি আপনি দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কথাবার্তা নিয়ে চিন্তা করেন যে, কোন সময়ে আপনি কি কথা বলেছিলেন, তাহলে আপনি আশ্চর্য হবেন, অজ্ঞাতসারে আপনি অনেক মিথ্যা বাহানার আশ্রয় নিয়েছেন। কাজ করতে গিয়ে ব্যবস্থা বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে অনেক সময় আমি দেখেছি, যখন কাকেও জিজ্ঞাসা করা হয়, মিঞা! এই কাজটা এইরূপ কেন করা হল? তখন তার প্রথম প্রতিক্রিয়া বাহানা তালাশের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। অনেক কম এমন স্পষ্টবাদী আছে যারা ইহার আদৌ কোন পরোয়া করে না যে, আমার ভুল আমারই প্রতি আরোপ হবে এবং উহা হতে বাঁচার কোন উপায় আমার নিকট নেই ; ইহা সত্ত্বেও তারা খুলে পরিষ্কারভাবে বলে যে, হাঁ, এটা আমারই ভুল। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে মানুষ অনেক টাল-বাহানা করে থাকে। টাল-বাহানা করার অভ্যাস ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে, অবশেষে মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। প্রয়োজনের সময় যারা মিথ্যা কথা বলে থাকে তারা সকলই আসলে টাল-বাহানাপ্রিয় লোক। এমন কোন ব্যক্তি প্রয়োজনে মিথ্যা কথা বলে না যার বাহানা করার অভ্যাস নেই। যে ব্যক্তি টাল-বাহানার উর্ধ্বে তার মধ্যে মিথ্যা কথা বলার শিকড়ই থাকে না। মানুষের স্বভাবে মিথ্যার শিকড় থাকে যা সাধারণভাবে দেখা যায় না। যে মিথ্যার বাহিরে দেখা যায় নিশ্চয় উহার শিকড় ভিতরেও আছে। সেই শিকড়গুলি যদি তালাশ করেন তাহলে আপনি বাইরের মিথ্যা হতে বাঁচার উপায়ও লাভ করতে পারবেন। এই ব্যাপারে চিন্তা করতে গিয়ে আমার দৃষ্টি সন্তানদের নিকট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়লো এবং আমার অনুমান, কেন কোন কোন পিতামাতা নিজেদের পশ্চাতে ভবিষ্যতের জন্য মিথ্যুক প্রজন্ম ছেড়ে যায়? অথচ তারা সত্য কথা বলার উপদেশ দানকারী লোক বটে। তাদের প্রকৃতি অবশ্য বড় শক্ত, ভুল তারা মোটে সহ্য করতে পারে না ; ইহা সত্ত্বেও তাদের সন্তান মিথ্যুক হয়। এইরূপ সন্তানদের অবস্থার প্রতি, এমন পরিবারের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আমি বুঝতে পারলাম, আসল ব্যাপার হল এই যে, সন্তানদের প্রতি অযথা কঠোর ব্যবহার মিথ্যার জন্ম দিয়ে থাকে যদি একটি সন্তান প্রত্যহ বিষয়টি জানে যে, আমার হাতে প্লেটটি ভেঙ্গে গেলে আমার উপর জুতা পড়বে আমার দ্বারা অমুক জিনিসটা ভুল হলে গালমন্দ দেয়া হবে বা মার দেয়া হবে, আমাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করা হবে ; সেই সন্তানের মন সব সময় বাহানা তালাশ করতে থাকে ; যেমনি একটু চোখ রাঙ্গিয়ে তার দিকে তাকানো হয় যে, আরে

এটা তুমি কী করেছ? তখনই সে কোন বাহানা বের করে ফেলে (নচেৎ তার বাঁচার উপায় নেই)। সুতরাং দেখতে তো পিতামাতা সত্যপরায়ণ, দেখতে তো পিতামাতা ভুলত্রুটিতে শাসন ব্যবস্থা গ্রহণকারী এবং তারা এই ধারণাপোষণকারী যে, এইভাবে আমরা সন্তানদিগকে সৎ ও পবিত্র করে তুলছি; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তারা এইরূপ চেষ্টার মাধ্যমে মিথ্যাবাদী প্রজন্ম গড়ে তুলেন; যেরূপ বয়স সেরূপ ব্যবহার করা উচিত। যদি অল্প বয়সে এত শক্ত ও কঠোর ব্যবহার করার আপনাদের অধিকার থাকে, যদি আল্লাহ্ তা'লা আপনাদিগকে শরীয়তের পূর্ণরূপে আনুগত্য করায় বাধ্য করতেন তা হলে আপনাদের মধ্যে কে আছে যে আযাব হতে নিষ্কৃতি পেতে পারতেন? তাই তো আঁ-হযরত (সাঃ) সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত সন্তানকে নামায পড়ার জন্য আদেশ দান করারও অনুমতি দান করেন নি। বলেছেন, সাত বৎসরের হলে স্নেহ-প্রীতির সাথে তাদিগকে বুঝাও, শামিল হলে হল, না হলে না হল, দশ বৎসর পর্যন্ত তাদের সঙ্গে এইরূপই ব্যবহার করতে থাকবে এমন কি যখন তাদের মনে নামাযের সম্পর্ক প্রগাঢ় হয়ে যাবে তখন তাদের উপর কিছু কিছু শাসন আরম্ভ কর এবং বার বৎসর পরে যখন তারা সাবালক হয়ে যায় তখন তাদের ব্যাপার আর খোদার ব্যাপার, তোমরা মধ্য হতে সরে পড়। এই উপদেশে গভীর প্রজ্ঞা নিহিত আছে। যারা সন্তানদের উপর ছোট ছোট বিষয়ে কঠোর ব্যবহার করে অথচ নামায ত্যাগ করা সর্বাধিক গুরুতর বিষয়, ইহার উপরও আঁ-হযরত (সাঃ) অনেক সীমিত কাল পর্যন্ত সীমিত উপায়ে কঠোর ব্যবহারের আদেশ দিয়েছেন। এইরূপ লোক (পিতা হউন আর মাতা হউন) নিজেদের সন্তানদিগকে ধ্বংস করে। আমি অনেক এমন যুবক দেখেছি, যুবক কেন, বয়স্ক লোককেও দেখেছি, তাদের বাল্যকালে পূর্ণ ছবি তাদের এই আচার-আচরণের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়, কথা জিজ্ঞেস করলে, কেন ভাই! এটা কি হল? তখন অকস্মাৎ তাদের মনে ভয় সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তৎক্ষণাৎ তারা কোন কোন বাহানা করার জন্য চিন্তা করে। এদ্বারা ঐ বেচারাদের দুঃখজনক বাল্যকালের দৃশ্য প্রস্ফুটিত হয় যে, তাদের ঘরে তাদের উপর না জানি কেমন দুরবস্থা ঘটেছিল তাদের পিতা-মাতা ছোট ছোট কথায় তাদিগকে নাজানি কত বকাবকি করেছিল এমন কি তাদের মধ্যে মিথ্যা কথা বলার বদ অভ্যাস হয়ে গেছে। (ক্রমশঃ)


**MUSLIM TV AHMADIYYA**

| | |
|---|---|
| SATELLITE | STATSIONAR-3 |
| POSITION | 85· EasT |
| BAND | C-band |
| TRANSPONDER | 10(Hemi Beam) |
| POLARITY | Right-hand circular |
| FREQUENCY | 3875 MHz |
| FORMAT | 625 Lincs PAL Color |

EVERY FRIDAY

Transmission will take place 1.15 p.m. London time

অনুগ্রহপূর্বক প্রতি শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম টি.ভি. দেখুন।

বাংলাদেশ সময়ঃ সন্ধ্যা ৭—১৫ মিনিটে।

# ৬৯তম সালানা জলসা

## আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

(১০–১২, ফেব্রুয়ারী–১৯৯৩)

# ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ

আশ্‌হাদু আন্ লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আম্মা বা'দু ফা আউযুবিল্লাহে মিনাশ শাইত্বানির রাজীম। বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

আল্‌হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আর রাহ্‌মানির্ রাহীম, মালেকে ইয়াউমীদ্দিন্। ইয়্যা কানা'বুদু ওয়া ইয়্যা কানাস্‌তাঈন্। ইহ্‌দিনাস্‌সিরাতাল মুস্তাকীম্। সিরাতাল্লাযীনা আন্‌আম্‌তা আলায়হিম্ গায়রিল মাগদুবে আলায়হিম ওয়ালাদ্দাল্লীন্। আমীন।

**প্রিয় ভাই ও বোনেরা**

আস্‌সালামু আলায়কুম্ ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ–এর ৬৯তম সালানা জলসার সমাপ্তি ভাষণে সংক্ষেপে আমাদের কর্ম প্রচেষ্টাকে আপনাদের সামনে তুলে ধরার পূর্বে কিছু প্রয়োজনীয় কথা বলতে হচ্ছে। কুরআন পাক এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)–এর সুন্নত ও হাদীস আমাদের শিক্ষা ও আদর্শের মূল উৎস। এ সবকে মূলধন করে আমরা ব্যক্তি, পরিবার, স্থানীয় সমাজ ব্যবস্থা ছাড়াও নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই।

**কুরআন চিরন্তন বিধান**

এ প্রসঙ্গে অনেকেই বলে থাকেন যে, ১৪০০ বৎসর পূর্বেকার কিতাব ও রসূলের শিক্ষা এবং আদর্শ বর্তমান জামানার চাহিদা মিটাতে পারে না। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পৃথিবী তো আর একস্থানে বসে নেই। জ্ঞান–বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতির দরুন মানুষের পরিবেশে যেমন অচিন্ত্যনীয় পরিবর্তন এসেছে তেমনি তা এসেছে তার জীবন–জীবিকায়ও। এখানে এসবের

বিস্তারিত ও চুলচেরা আলোচনায় যাওয়া যাবে না। তাই আমরা অতি সংক্ষেপে নীতিগতভাবে দেখবো যে, কুরআন ও রসূল করীম (সাঃ)–এর শিক্ষা ও আদর্শ আমাদেরকে পথ নির্দেশনা দিতে পারে কি–না। মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে এমন কোন মৌলিক আবিস্কার ও শিক্ষা থাকে যা কখনো পুরোনো হয় না এবং এসবকে জীবন থেকে বাদ দেয়া যায় না। সময়ের ব্যবধানে এসবের শাখা–প্রশাখা নানাভাবে আমাদের জীবন ও জীবিকায় বিস্তার লাভ ও পরিবেশকেও বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত করে থাকে। দু'টো উদাহরণ নেয়া যাক–অক্ষর ও সংখ্যা (ডিজিট) যথা–অ, আ, ০, ১, ২------৯ ইত্যাদির আবিস্কার। অক্ষর দ্বারা আমাদের চিন্তা–ভাবনা যা চোখে দেখা যায় না তা–ই আমরা হাতে লিখে বই পুস্তকাদি প্রকাশ করে স্বয়ং উপস্থিত না হয়েও অন্যের চোখের সামনে তুলে ধরি।

অক্ষর হাজার হাজার বৎসর পূর্বে আবিস্কৃত হয়েছিল কিন্তু তাই বলে আমাদের জীবন থেকে তো তা বাদ দিতে পারছি না। বরং আমরা দিন দিন নানা যন্ত্রপাতি যেমন, উন্নত হতে উন্নততর প্রেসাদি আবিস্কার করে অক্ষরের ব্যবহারকে দিন দিন ব্যাপকতর করে তুলছি। যে পর্যন্ত আমাদের ভাবকে বন্দী করার অক্ষরবিহীন আরো উন্নতমানের কোন ফন্দি আবিস্কার করতে না পারছি ততদিন পুরোনো দিনের আবিস্কার বলে অক্ষরকে অবহেলা করা বোকামী হবে না কি? উপরোল্লেখিত সংখ্যার ব্যাপারটিও ভেবে দেখা দরকার। একটি শূন্য ও নয়টি ডিজিট দ্বারা কত সংখ্যা যে আমরা লিখেছি তা বলে শেষ করা যাবে না। আরোও কত যে লিখতে পারবো তারও ইতি বলা যায় না। অর্থাৎ আমাদের প্রয়োজনে যত সংখ্যাই লিখি না কেন যত অংকই কষি না কেন মূল সংখ্যা বা অক্ষর ঐ কয়টিই। আমরা যদি কৃষি, আগুন, বিদ্যুৎ এসব আবিস্কারের কথা নিয়েও বিচার বিবেচনা করি তবে দেখা যাবে যত আগেই এগুলোই আবিস্কার হয়ে থাকুক না কেন আমাদের জীবনে এসবের অনুপ্রবেশ, প্রভাব ও বিস্তার ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এইগুলো কি পুরোনো বলে আধুনিক জীবন থেকে বাদ দেয়া যাবে? এরূপ চিন্তা করাও বাতুলতা। অবশ্যই জ্ঞান–বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরশ এগুলোর প্রভূত উন্নতি সাধন করে চলেছে। কালোত্তীর্ণ সাহিত্যের বেলায়ও দেখা যায় সময় ও ভৌগোলিক দূরত্ব, পরিবেশের পরিবর্তন এসবকে কোন গন্ডিতে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। তাই আমরা ঈশপ (গল্প লেখক), হোমার, হাফেয, কালিদাস, সেক্সপীয়ারদেরকে কখনও ভুলতে পারছি না।

এই সব ব্যাপারে যে বিষয়টি আমাদের বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে তাহলো যিনি বা যারা মৌল আবিস্কার ও ধারণা দিয়ে থাকেন তারাই ঐ আবিস্কারের পরবর্তী ব্যবহার সম্বন্ধে সবকিছু বলে যেতে পারেন না। হয়তো ধারণাও করতে পারেন না। এ সবের মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। পরবর্তীরা নানা প্রয়োগ ব্যবস্থার উদ্ভাবন দ্বারা ঐ সব মৌল আবিস্কারের বহুমাতৃক ব্যবহারকে আমাদের জীবনে অত্যাবশ্যকীয় করে তুলে। এখন দেখা যাক ধর্মীয় ক্ষেত্রে কুরআন পাক এরূপ মৌল–বিষয়াদির সন্ধান দেয় কি–না। যদি না দেয় তাহলে কুরআন নিয়ে আমাদের ব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। আর যদি দেয় তবে তা অবহেলা করা কিছুতেই উচিত নয়। আমার বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে পেশ করার জন্যে তিনটি মাত্র উদাহরণ নিবো–(১) কুরআন পরস্পরের মাঝে দেখা সাক্ষাতে সালাম বলা ও প্রতি উত্তরের তাগিদ দিয়েছে। রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন–"তোমরা চিনা–অচিনা সবাইকে সালাম বলিও"। এতে সহজেই উপলব্ধি

করা যায় যে, যে কোন মুসলমান তার অজ্ঞাতসারেই দুনিয়ার যে কোন লোকের সাথে পরিচিত (Introduced) হয়ে আছে। এজন্যে তার অন্য কারোও মধ্যস্থতার প্রয়োজন পড়ে না। সালাম দেয়ার অর্থ হলো–শান্তি কামনা করা। এর একটি বড় তাৎপর্য হলো পরস্পরের মাঝে সংযোগ সাধন। আমরা যদি কারো শান্তি চাই কিন্তু আচরণ দ্বারা তার অশান্তির কারণ হই তবে নিশ্চয়ই কথা ও কাজের অমিলের জন্যে আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না। সর্বযুগে সারা বিশ্বেই যে শান্তির প্রয়োজন এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং এ শিক্ষা কখনো পুরোনো হতে পারে না। অশান্তি, সন্ত্রাস ইত্যাদিতে মানবতার পূর্ণ বিকাশ সহজতর এবং মানুষের অগ্রগতির পথ যদি কখনও প্রশস্ততর হয় তখন হয়তো সালাম সংক্রান্ত কুরআনের নির্দেশ পালনের প্রয়োজন হবে না। এমন দিন কখনও আসবে কি? আসলে প্রয়োজন হলো–শান্তি চাওয়ার সাথে কার্যকর নিষ্ঠাকে সংযুক্ত করা। আহমদীয়া মুসলিম জামাত তাই করার চেষ্টা করছে। (২) কুরআনের শিক্ষা হলো দুনিয়াতে যত নবী রসূল প্রেরিত হয়েছেন সবার উপরে সমভাবে ঈমান আনা। এর মাধ্যমে কুরআন সমগ্র মানবজাতিকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করার অনন্য সাধারণ হেকমত শিখিয়েছে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, মুসলমানেরা এই হেকমতটিকে পরিপূর্ণ ও প্রজ্ঞার সাথে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। সব নবীকে মানার তাৎপর্য হলো, কোন জাতিকে যেন ঘৃণা না করে মহব্বতের মাধ্যমে সব জাতির সাথে প্রেমপ্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হবার চেষ্টা করি। যতদিন মানব জাতির মধ্যে ঐক্য বোধ জাগ্রত ও সক্রিয় না হবে ততোদিন এই শিক্ষাকে দূরে ঠেলে দিলে মানব জাতির ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না। (৩) কোন ধর্মে ক্ষমাকে প্রাধান্য দিয়েছে, কোন ধর্মে প্রতিশোধকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছে। ক্ষমার দ্বারা যদি অপরাধীর সংশোধনের সম্ভাবনা থাকে তবে ইসলাম তাই করতে বলেছে। যদি প্রতিবাদ, প্রতিশোধ ও প্রতিরোধ দ্বারা তথা শাস্তির দ্বারা অপরাধীর সংশোধন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে তাই করতে বলা হয়েছে। এতেই বুঝা যায় কুরআনের এই শিক্ষাও কালোত্তীর্ণ। যদি অনুগামীরা কোন কিতাব ও তার বাহকের শিক্ষা ভুলে যায় বা তাতে মিশ্রণ ঢুকায় বা এসবের অপব্যবহার করে তার জন্যে কেউ যদি ঐ শিক্ষাকে বাতিল করে দেয় তাও একটি মারাত্মক ভুল হবে এবং জগৎ মহৎ শিক্ষা হতে বঞ্চিত হবে।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)–মারফত আল্লাহ্‌তা'লা জানিয়েছেন যে, মুসলমানদের চরম অধঃপতন ঘটবে। তারা কুরআনের শিক্ষা হতে দূরে চলে যাবে। তখন ইসলামকে পুনর্জীবিত ও পুনর্বাসিত করার জন্যে ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)–এর শুভাগমন হবে। উল্লেখ্য যে, এই সব ভবিষ্যদ্বাণীর দু'টো দিকই পূর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ মুসলমানদের চরম অধঃপতন যেমন হয়েছে তেমনি হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)–এর শুভাগমনও ঘটেছে। তাঁর পূত নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)। তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে লিখিত তাঁর জোরদার কলমের মাধ্যমে কুরআন পাকে যে আমাদের জামানার সমস্যাদি সমাধানের উপাদান নিহিত রয়েছে সেই গূঢ় সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর লিখিত পুস্তকাদি (আটাশি খানা) পড়লে সেই সন্ধান মিলে। বেশ কয়েকটি পুস্তকের বাংলা তরজমা করা হয়েছে যেমন–কিশ্‌তিয়ে নূহ্, পয়গামে সুলাহ্ (শান্তির বাণী), ফতেহ ইসলাম, ঐশী বিকাশ, ইসলামী উসূল কী ফিলোসফি (ইসলামী নীতিদর্শন) ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, কোন বড় শিক্ষা ও আদর্শকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বাস্তবায়িত করতে হলে

নেতৃত্ব ও সংগঠনের সাথে অনুগামীদের যোগ্যতা অর্জনের স্পৃহা ও পূর্ণ আনুগত্য থাকা চাই। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেই সব ব্যবস্থাও করেছেন। কুরআনের বিধানমতে তিনি হযরত রসূল করীম (সাঃ)–এর 'অনুগামী নবী' হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন এবং তাঁর তিরোধানের পর এই জামা'তেই ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। এই খেলাফতের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হচ্ছে। এই জামা'তে রয়েছে আনসারুল্লাহ (৪০ অনূর্ধ বয়সের পুরুষের সংগঠন), লাজনা ইমাইল্লাহ (বয়স্ক মহিলা সংগঠন), খোদ্দামুল আহমদীয়া অর্থাৎ যুবকদের সংগঠন, (১৫–৪০ বৎসর বয়স্ক পুরুষদের সংগঠন), তাছাড়াও রয়েছে ছোটদের সংগঠন–আতফালুল আহমদীয়া ও নাসেরাতুল আহমদীয়া। বিভিন্ন সংগঠন যেমন নিজেদের কার্যসূচী বাস্তবায়ন করে থাকে তেমনি সম্মিলিতভাবেও অনেক কার্যক্রম সমাধা করে থাকে। এখন এসব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হচ্ছেঃ

**সীরাতুন্ নবী (সাঃ)–এর জলসাঃ**

কুরআন মজীদের শিক্ষা ও আদর্শকে সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম ও অনুসরণ করতে হলে কুরআন ও হুযুরে পাক (সাঃ)–এর বিশুদ্ধ জীবন পরস্পরকে পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করতেই হবে। বিশুদ্ধ জীবন কথাটি এ জন্যেই বলা হলো যে, হযরত নবী করীম (সাঃ)–এর জীবনীতে অনেক কল্পকাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে। অথচ এ সবের সাথে এই পবিত্র জীবনের কোনই সম্পর্ক নেই। রসূল করীম (সাঃ)–এর জীবনী আলোচনায় আমাদেরকে তিনটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে ঃ (১) জনগণের সামনে কল্পকাহিনীর অসারতা প্রমাণ করা, (২) কুরআন ভিত্তিক জীবনী প্রচার করা, (৩) বর্তমান জামানার সমস্যাদি সমাধানের জন্যে ঐ জীবনী হতে উপাদান সংগ্রহ করা।

১৯৯২ সালে ৩৩টি জামাত হতে ৩৬টি সীরাতুন নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠানের সংবাদ আমরা পাক্ষিক আহমদী পত্রিকার মাধ্যমে পেয়েছি। এ ছাড়াও বিভিন্ন স্থানীয় জামাত ও ঢাকা জামাতের বিভিন্ন হালকায় সীরাতুন নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

**মসজিদ ও মিশনঃ**

ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বাস্তবায়নের জন্যে মসজিদ অত্যাবশ্যক। বর্তমান জামানায় ইসলাম প্রচারের মহান দায়িত্বকে সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে হলে অফিস, লাইব্রেরী, কর্মচারীদের বাসস্থান, মেহমান খানা, তালীম–তরবীয়তের জন্যে সুবিধাদি থাকা একান্ত প্রয়োজন। এ সব একই স্থানে করতে পারলে কাজ করা খুবই সহজসাধ্য। এই জন্যে আমরা সীমিত সামর্থ্য নিয়েও মসজিদ ও মিশন স্থাপনের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি। ১৯৯২ সালে যা করা হয়েছে সংক্ষেপে তা হলো (১) পুরুলিয়া (নাটোর) অর্ধসমাপ্ত মসজিদ নির্মাণের জন্যে অনুদান (২) তেবাড়ীয়া (নাটোর) সাইক্লোনে ক্ষতিগ্রস্ত মসজিদ মেরামত ও মসজিদ সংলগ্ন মোয়াল্লেম কোয়ার্টার নির্মাণের জন্যে অনুদান (৩) তেরগাতীতে স্থানীয় প্রচেষ্টায় নির্মিত মসজিদকে পাকা করার জন্যে অনুদান (৪) আহমদনগর (পঞ্চগড়) শালসিঁড়ি হালকায় নতুন

মসজিদ নির্মাণের অনুদান (৫) ভাতগাঁও জামাতে স্থানীয় প্রচেষ্টায় পাকা মসজিদ নির্মাণ (৬) শাহাবাজপুর (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) সাইক্লোনে ক্ষতিগ্রস্ত মসজিদের মেরামতের জন্যে অনুদান (৭) নারায়ণগঞ্জ মসজিদ ও কমপ্লেক্স মেরামতের জন্যে অনুদান (৮) খুলনায় নতুন মসজিদ নির্মাণের জন্যে অনুদান (৯) চট্টগ্রামে সদর মুরব্বী কোয়ার্টার সংস্কারের জন্যে অনুদান (১০) বগুড়া মসজিদ সংলগ্ন মুরব্বী কোয়ার্টার ও মেহমানখানা আংশিক মেরামত ও পুনর্নির্মাণের জন্যে অনুদান (১১) নিউ সোনাতলা (বগুড়া) মসজিদ সংলগ্ন মোয়াল্লেম কোয়ার্টারের জন্যে অনুদান।

এ ছাড়া আরও নিম্নবর্ণিত জামাতের মসজিদের জন্যে অনুদান দেয়া হয়েছে–তারুয়া, ক্রোড়া উথলী, শ্যামপুর, তাহেরাবাদ, দূর্গারামপুর ও ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

সব মিলে অনুদান হলো টা=২,৪৭,২০০/মাত্র।

এ সব কাজ সমাধা হয়েছে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, রাজশাহীতে মসজিদ ও মিশন কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্যে স্থানীয় জামাতের চাঁদা ও আমাদের অনুদানে কাজ কিছুটা অগ্রসর হলে মুখালেফগণ দিন দুপুরে তা ধ্বংস করে দেয় এবং নির্মাণ সামগ্রীসহ সব মালামাল লুট করে নেয়। এ প্রসঙ্গে যে বিষয়টি উল্লেখের দাবী রাখে তাহলো মসজিদ ও মিশন স্থাপনের প্রাথমিক ও প্রধান দায়িত্ব স্থানীয় জামা'তের। যেহেতু আমরা বিশ্বব্যাপী একটি সুসংগঠিত জামা'ত তাই যেখানে যতটুকু প্রয়োজন ও সম্ভব সেখানে কেন্দ্র হতে এসব কাজে আমরা অংশ নিয়ে থাকি।

**সালানা জলসাঃ**

১৯৯২ সালে বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সালানা জলসা ছাড়াও ক্ষুদ্রপাড়া, খুলনা, সুন্দরবন, খাকদান, কুকুয়া ও ভাতগাঁও জামা'তে অনুরূপ জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জামা'তের অগ্রগতিকে ক্রমবর্দ্ধমান করে তোলার জন্যে সালানা জলসার গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবেশ ও পরিস্থিতি প্রতিকুল না হলে বিভিন্ন জামা'তের উচিত হবে যথাসম্ভব সালানা জলসার অয়োজন করা। এতে একদিকে যেমন প্রচার কার্য ব্যাপক হবে অপরদিকে আমাদের সাংগঠনিক শক্তিও পুষ্টি লাভ করবে।

**কর্মীদলঃ**

বর্তমান ঢাকাস্থ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন স্থানীয় জামা'তে ৮জন সদর মুরব্বী ও ৩১জন মোয়াল্লেম কর্মরত আছেন। প্রয়োজনের তুলনায় এই সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। আমাদের সীমাবদ্ধতার দরুন এই সংখ্যা বর্ধিত করাও সহজ নয়। আমরা যদি নারী–পুরুষ সবাই সাধ্যমত তালীম, তরবীয়ত ও তবলীগের কাজে বিশেষ করে ওয়াকফে আরযীতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করি তবে এই অভাব অনেকখানি পূরণ হবে এবং এই দায়িত্ব পালন দ্বারা আমরাও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করবো।

**তাহরীকে ওয়াকফে নওঃ–(নব উৎসর্গের ঘোষণা)**

আমাদের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) ইসলামের আদর্শে অবক্ষয়মুক্ত নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তেলার লক্ষ্যে ''তাহ্‌রীকে ওয়াক্‌কে নও" জারি করেছেন।

ইহা মানব কল্যাণের একটি অনন্য–সাধারণ পরিকল্পনা। এতে সন্তান মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ই পিতা–মাতা সন্তানকে ইসলামের জন্যে উৎসর্গ করে দেন। তাদেরকে ইসলামের নিঃস্বার্থ সেবার জন্যে বিশেষ যত্ন সহকারে লালন-পালন ও শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ১৩০ জন ওয়াক্‌কে নও রেকর্ডভুক্ত হয়েছে। তাদের দেখা শুনার জন্যে ৩৪ জন স্থানীয় সুপারভাইজর নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সার্কুলার ও পাক্ষিক আহমদী মারফত অবহিত করা হয়েছে। এ সর্ম্পকে ''তাহরীকে ওয়াক্‌ফে নও ও হামারী জিম্মাদারীয়াঁ" বাংলা তরজমা সুপারভাইজর ও পিতা–মাতাদের নিকট প্রেরিত হয়েছে। তাদেরকে পিতা–মাতার সাথে ও কাজের অগ্রগতি নিয়ে কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

**পাবলিকেশনঃ**

এ সম্পর্কে যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ববহ তা হলো জ্ঞান শুধু কল্যাণ নয় অকল্যাণেরও উৎস হয়ে থাকে। এ জামানায় বিশ্বব্যাপী চরম অবক্ষয়ের একটি প্রধান কারণ হলো জ্ঞান–বিজ্ঞানের প্রচুর অপব্যবহার। এই অবক্ষয় রোধ করতে হলে মানুষকে ব্যাপকভাবে 'পবিত্রকরণ প্রক্রিয়া' সংক্রান্ত জ্ঞানে জ্ঞানবান করতে হবে। এই মহান কাজ সুসম্পন্ন করার জন্যে আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)–কে ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্‌রূপে প্রেরণ করেছেন। ইসলামের এই একনিষ্ঠ সেবককে আল্লাহ্ 'সুলতানুল কলম' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তাই আমাদের প্রচারের কাজে কলম তথা পাবলিকেশনের উপর বিশেষ জোর দিতে হবে এবং দেয়া হচ্ছেও। এজন্যে জামা'ত পুস্তক–পুস্তিকা, বুলেটিন–ফোল্ডার ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকে। কোন কোন সদস্যও জামাতের অনুমতি নিয়ে পুস্তকাদি ছাপিয়ে তবলীগের কাজে বিশেষ সহায়তা করে থাকেন। তাঁদের জন্যে দোয়া করা আমাদের নৈতিক কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে পাক্ষিক আহমদী ছাড়া অন্যান্য প্রকাশনার তালিকা দেয়া হলো ঃ–

**পুস্তক–পুস্তিকা ঃ**

১। খাতামান্নাবীঈন (সাঃ), ২। পয়গামে সুলাহ, ৩। এক গলতি কা ইযালা, ৪। জুমআর খুতবা, ৫। যুগে যুগে কুফরী ফতওয়া ও ফিরকাবাজী, ৬। আহমদী এবং গয়ের আহমদীদের মধ্যে পার্থক্য, ৭। আহমদীরা কি সত্যিকার মুসলমান নয়? ও ৮। অযথা বিভ্রান্তি।

**ফোল্ডার ঃ**

১। চলুন জলসায় যোগদান করি, ২। বয়াত ফরম, ৩। মানব জীবনের পরিধি, ৪। শুনাতেই সোয়াব, ৫। জেহাদ বিল কুরআন, ৬। লোকে যাই বলুক আমার কথা ভিন্ন, ৭। জামা'তের ব্যবস্থাপনায় কর্মকর্তাদের দায়–দায়িত্ব, ৮। মোমেন ন্যায় বিচারের জীবন্ত প্রতীক, ৯। মহাজিজ্ঞাসা, ১০। অমুসলমান ঘোষণার অইসলামী দাবী, ১১। খতমে নবুয়তের অস্বীকারকারী কে? ১২। ভেবে দেখা দরকার ও ১৩। মুসলমান কে?

মোহতারম মোহাম্মদ ইয়ামীন সাহেব যে সব পুস্তক অনুদান হিসেবে দিয়েছেন ঃ–

1. Garden of the Rightious, 2. Muhammad Seal of the Prophets, 3. The Philosophy of the teachings of Islam,

4. Khataman Nabiyyeen, 5. সীরতে সুলতানুল কলম। 6. Invitation to Ahmadiyyat.

**প্রদর্শনী ঃ**

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের শত বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে বিভিন্ন দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক প্রদর্শনী খোলা হয়। এ সবের মাধ্যমে বিশ্ব-ব্যাপী এ জামাতের কার্যক্রমকে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়। বাংলাদেশে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও আহমদনগরে প্রদর্শনী খোলা হয়। বিভিন্ন দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক যেসব প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় তন্মধ্যে ঢাকার প্রদর্শনী একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে ছিল। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, ২৯শে অক্টোবরে (১৯৯২) আহমদীয়া কমপ্লেক্সে যে জঘন্য হামলা হয় তা হতে প্রদর্শনীটিও রক্ষা পায়নি। এতে রক্ষিত অন্যূন ৫৪টি ভাষায় কুরআন শরীফ সহ (আরবী তরজমা ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা) বহু প্রদর্শনযোগ্য মূল্যবান বই-পুস্তক, ছবি ইত্যাদি পুড়ে ফেলা হয়। এখানে সান্ত্বনার বিষয় এই যে, যারা আগে এ প্রদর্শনী দেখেছেন তাদের অনেকেই এ দুর্ঘটনার পর প্রদর্শনী দেখতে এসে গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছেন। আর যারা প্রথম দেখতে এসে প্রদর্শনীর ছাই-ভস্ম দেখছেন তারাও বেদনাহত হয়েছেন। আর তারা হামলাকারীদের প্রতি কঠোর ভাষায় মন্তব্য করেছেন। ১৯৯২ সালে যারা প্রদর্শনী দেখেছেন তাদের সম্পর্কে কিছু পরিসংখ্যান দেয়া হলো ঃ- মোট দর্শক ছিলেন প্রায় ৭০০০ হাজার। তন্মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক ছিলেন ৭৭২ জন, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১৫৬৭ জন, মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১২৪০ জন, ছাত্র ছাত্রীদের অভিভাবক ও অভিভাবিকা ছিলেন ৫০০ জন, ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবী ছিলেন ১৫০০ জন, সাংবাদিক ছিলেন ৯১ জন, বিদেশী ছিলেন ৬ জন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছিলেন ৬০ জন পুলিশ অফিসার ছিলেন ১২ জন, উকিল ৪ জন এবং সাধারণ দর্শক ছিলেন ৩৫০ জন। ঢাকায় মোট দর্শক ছিলেন ৪৯০০ জন, চট্টগ্রামে ১১১৭জন, খুলনায় ৫০০ ও আহমদনগরে আনুমানিক ৩০০ জন।

**সমসায়িক পত্র-পত্রিকা ঃ**

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এবার অনেক বেশী ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। বিশেষ করে ২৯শে অক্টোবরের জঘন্য আক্রমণের পর প্রত্যক্ষভাবে অনেক প্রবন্ধ আমাদের অনুকূলে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রবন্ধে পরোক্ষভাবেও আমাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। ২৭শে নভেম্বরে রাজশাহীতে আমাদের নির্মাণাধীন কমপ্লেক্সকে ধ্বংস করার পর আবারও সম-সাময়িক পত্র-পত্রিকাদিতে আমাদের খবরাদি বেশ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হতে থাকে। তাতে আমাদের প্রচার কাজের প্রয়োজন ও ব্যাপকতাও বেড়ে গেছে।

**জামা'ত পরিদর্শনঃ**

উল্লেখ্য যে, ন্যাশনাল আমীর, নায়েব আমীরগণ ও সেক্রেটারীগণ বিভিন্ন জামাত সফর করেন। অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে, সফর স্থানীয় জামা'তের জন্যে খুবই কল্যাণকর। সফরের পরিমাণ বাড়াতে সবারই তৎপর হওয়া প্রয়োজন।

**বয়াতের সংখ্যাঃ**

১৯৯২ সালে আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে ২১৩ জন ভ্রাতা-ভগ্নী বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতে দাখিল হয়েছেন। আমরা তাদের সামগ্রিক কল্যাণ কামনা করে দোয়া করছি। এখানে একটি কথা বিশেষ জোর দিয়ে উল্লেখ করতে চাই যে, এই সংখ্যাতে সন্তুষ্ট থাকা আমাদের কিছুতেই উচিত নয়। আমাদের তাক্‌ওয়া ও দোয়ার সাথে কর্ম প্রচেষ্টাকে অনেক বাড়াতে হবে যাতে এ দেশের প্রিয় ভাই-বোনেরা খুব কম সময়ের মধ্যে সত্যের সন্ধান পায় ও গ্রহণ করে।

**জামা'তের আর্থিক অবস্থা ঃ**

১৯৯১-৯২ সালে বাজেট ছিল টা-২৯,৫০,০০০/= আদায় হয়েছে টাঃ ২৬,৫৯,০০০/= টাকা। ইহা পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ১৮·৭১٪ বেশী। উল্লেখ্য যে, আমাদের আর্থিক কুরবানীর উপর জামাতের সার্বিক উন্নতি নির্ভরশীল। সুতরাং এদিকে আমাদের সবারই মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

**ওয়াক্‌ফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদ ঃ**

১৯৯২ সালের ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা আদায় হয়েছে টা-১,৩৬,০০০/-, (এক লাখ ছত্রিশ হাজার) এবং তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায় হয়েছে টা-২,১৩,০০০/-(দুই লাখ তের হাজার) টাকার কিছু বেশী। এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত রিপোর্ট পেলে মূল্যায়ন সহজ হতো। বলা বাহুল্য, ২৯শে অক্টোবরের হামলায় আমরা অনেক রেকর্ড হারিয়েছি।

**রিশ্‌তানাতার কাজ ঃ**

১৯৯২ সালে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে ৮৭টি। বিয়ে হয়েছে ৫১টি। ১৯৯১ সনের প্রস্তাবসহ আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত প্রস্তাব রয়েছে ৫৮টি। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্যে তাগিদ পত্রও দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিয়ের ব্যাপারে স্থানীয় জামাতের দায়িত্ব সর্বাধিক। অপরদিকে সদর হতে আমরা যে সকল চিঠি-পত্র ও সার্কুলার দিয়ে থাকি ব্যক্তিগত ও জামাতী পর্যায়ে যথাসত্বর এগুলোর জবাব না দিলে আমাদের পক্ষে কাজ তরান্বিত করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

**অডিও ও ভিডিও বিভাগ ঃ**

অডিও ক্যাসেট ঃ জুলাই ৯২ থেকে ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৯৩ পর্যন্ত আমরা লণ্ডন থেকে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে'র (আইঃ) ২৫ (পঁচিশ)টি খুতবার ক্যাসেট পেয়েছি। এর মধ্যে ১৫· (পনর)টি মূল উর্দূ ও ১০ (দশ)টি ইংরেজী অনুবাদ। এ যাবৎ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ)টি উর্দূ ক্যাসেট মুরব্বী/ মোয়াল্লেমদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

তাছাড়া ১০০টি ক্যাসেট জামা'তের বিভিন্ন পর্যায়ের ৬৬ জন সদস্যকে নিজেদের ঘরে শুনার জন্যে ফেরত দেয়ার ভিত্তিতে বিতরণ করা হয়েছে। জনাব মোহাম্মদ শামসুল হক ও জনাব

মোহাম্মদ নূরুল হক এ দু' ভাই একটি ক্যাসট রেকর্ডার দিয়ে জামা'তের অভাব পূরণ করেছেন।

শুধুমাত্র অডিও ক্যাসেটের সারা বছরে ৫২টি শুক্রবারের খুতবা ১২ (বার) জন মুরুব্বী/মোয়াল্লেমের মধ্যে বিতরণ করতে ৩২,০০০/ (বত্রিশ হাজার) টাকা লাগে। অথচ কমপক্ষে ৫০ (পঞ্চাশ)টি জামাতকে এ সুবিধা দিতে টাঃ ১,৩০,০০০/– (এক লাখ ত্রিশ হাজার) টাকার প্রয়োজন। তাই, আমি অবস্থাপন্ন ভাইদের কাছে এ ব্যাপারে আর্থিক কুরবানীর আবেদন করছি। আল্লাহ্‌র খলীফার কণ্ঠস্বর জামা'তের আবাল–বৃদ্ধ–বণিতার কানে পৌছুলে উন্নতি দ্রুততর হবে।

**ভিডিও ক্যাসেট ঃ**

আমরা **ফেরৎ দেয়ার ভিত্তিতে** জামা'তের প্রায় চল্লিশজন সদস্যের মধ্যে ৫৩ (তিপ্পান্ন)টি বিবিধ ঘটনাবলী সম্বলিত ভিডিও ক্যাসেট প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছি।

তাছাড়া পার্শ্ববর্তী কলেজটিতে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে দারুত তবলীগে আগত প্রায় সহস্রাধিক অভিভাবক/অভিভাবিকাদেরকে আমরা জামাতের বিভিন্ন জলসা অনুষ্ঠানের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছি। হুযূর (আইঃ) এ ব্যবস্থাটিকে খুবই পসন্দ করেছেন।

অডিও ভিডিও বিভাগের তরফ থেকে প্রয়োজন মোতাবেক আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ভিডিও করার কাজ অব্যাহত রয়েছে। ভবিষ্যতে এ বিভাগের আরো উন্নতির চিন্তা–ভাবনা চলছে।

**অঙ্গ সংগঠনসমূহঃ**

অঙ্গ সংগঠনসমূহের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষেপে এসব সংগঠনের কর্ম প্রচেষ্টার একটি রূপরেখা দেয়া হলোঃ

**মজলিসে আনসারুল্লাহ সিলসিলা আলীয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ঃ**

আনসারুল্লাহ নিজের কর্ম প্রচেষ্টাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ৬১টি স্থানীয়, ১৯টি জিলা এবং ৪টি বিভাগীয় মজলিসে বিভক্ত করেছেন। এ মজলিস ১৯৯২ সালে ১৬টি মজলিসে আমেলার মিটিং করেছেন। বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও অতি বিভীষিকাময় অবস্থার মধ্যেও বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ সাহসীকতার সাথে হুযূর আকদাস (আইঃ) কর্তৃক অনুমোদিত ও নির্ধারিত তারিখে ৭ম তালীমুল কুরআন ক্লাশ ও ১৫তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত করেছেন। তালীমুল কুরআন ক্লাশে ৩৯টি মজলিস থেকে ৪৯জন আনসার শিক্ষা গ্রহণের জন্যে যোগদান করেন এবং বার্ষিক ইজতেমায় ৪২টি মজলিস থেকে ১৫০ জন আনসার উপস্থিত হন। ১৯৯২ সালে ২২৭ জন আনসার তবলীগে অংশ গ্রহণ করে ২৬৮৬ খানা পুস্তক বিতরণের মাধ্যমে ১৫৮৭ জনকে তবলীগ করেন এবং তাদের প্রচেষ্টায় ৮৭ জন বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে দাখিল হন।

**প্রকাশনাঃ**– এই বৎসর হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রণীত ''তাজকিরাতুশ শাহদাতাইন" কিতাবের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হয়। মজলিসে আনসারুল্লাহর ৫ জন সদস্য এ বছর ১৭টি স্থানীয় মজলিস সফর করেন। নতুন বয়াতকারী ও কয়েকজন দুস্থ ভ্রাতার মাঝে আর্থিক সহায়তাও প্রদান করা হয়। বিশেষ উল্লেখ্য যে, আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী

সাহেব এই বৎসর হুযূর আকদাস (আহঃ) ও মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নির্দেশ মোতাবেক আন্তর্জাতিক জামা'তসমূহে সফর করেছেন, যেমন–কানাডা, আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, কলিকাতা, উড়িষ্যা ও আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জামা'ত।

**মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশঃ**

এ মজলিসের অধীনে বর্তমানে বাংলাদেশে ৬টি রিজিওন্যাল, ১৬টি জিলা ও ৮৫টি স্থানীয় মজলিস রয়েছে।

**পরিদর্শনঃ**

১৯৯২ সালে বাংলাদেশে মজলিসের কর্মকর্তাগণ দেশের সকল স্থানীয় মজলিস পরির্দশন ও অডিট করেছে।

**ইজতেমাঃ**

কেন্দ্রীয় ইজতেমা ছাড়াও রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রামে রিজিওন্যাল ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং স্থানীয়ভাবেও বেশ কিছু মজলিস ইজতেমা করেছে।

**প্রকাশনাঃ**

বাংলাদেশ মজলিস কর্তৃক ৪(চার) রঙ্গের ক্যালেন্ডার বেশ সুনাম অর্জন করে এবং কাদিয়ান জলসার মাধ্যমে ইহা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পৌছে যায়। মজলিসের মুখপত্র ''আহ্‌বানের" প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। ''দেশে দেশে আহমদীয়াত" নামে একটি তথ্যবহুল পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। ''মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ–এর গঠনতন্ত্র" ও এ বছর বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করা হয়েছে।

**উমূরে তোলাবাঃ**

আহমদী ছাত্রদেরকে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য এই বিভাগ দু'টি সার্কুলারের মাধ্যমে স্থানীয় মজলিসসমূহে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শ দিয়েছে এবং মেধাবী ছাত্রদেরকে পুরস্কৃত করেছে।

**ওয়াকারে আমলঃ**

এবারের উল্লেখযোগ্য কাজ হলো বৃক্ষ রোপণ। প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৫৮৩টি গাছ লাগানো হয়েছে। এই বৃক্ষ রোপণের খবরটি বিভিন্ন পত্র–পত্রিকায় প্রশংসনীয়ভাবে প্রকাশিত হয়। সৈয়দপুরে বৃক্ষ রোপণের খবরটি ৩রা আগষ্ট '১৯৯২ তারিখে রেডিও বাংলাদেশের স্থানীয় সংবাদে প্রচার করা হয়। বগুড়া মজলিসে বৃক্ষ রোপণের খবর ''দৈনিক ''করোতোয়ায়" এবং ঢাকা মজলিসের খবর "দৈনিক ইত্তেফাকে" ছাপা হয়েছে।

**কর্মশালাঃ**

১২ই জুলাই, ১৯৯২ইং তারিখে বাংলাদেশ মজলিসের এবং ২৫শে জুন '৯২ তারিখে চট্টগ্রাম রিজিওন্যাল মজলিসের স্থানীয় মজলিসসমূহের সমন্বয়ে পৃথক পৃথক দু'টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

**তালীম-তরবীয়তঃ**

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ প্রতি বছরের ন্যায় এবারও তালীম তরবীয়তি ক্লাশের আয়োজন করে।উল্লেখ্য যে, এই বৎসর অধিকাংশ স্থানীয় মজলিসও তালীম তরবিয়তী ক্লাশ সম্পন্ন করে।

**আতফাল বিভাগঃ**

আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আমাদের তিফলদেরকে (শিশু) ছোট বেলা থেকেই প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে আমাদের আতফালুল আহমদীয়া সংগঠন প্রতিষ্ঠিত। এ বছর অধিকাংশ মজলিসে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে 'আতফাল দিবস' পালিত হয়েছে।

**সুধী সমাবেশঃ**

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ ২০শে ফেব্রুয়ারী, '৯২ তারিখে হোটেল শেরাটনে এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীগণ উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেনঃ (১) মোহতারম মির্যা আব্দুল হক এবং (২) মোহতারম এডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেব।

**তবলীগি সেমিনারঃ**

গত মে মাসে বিশেষ অতিথি আমীর মোহতারম চৌধুরী আহমদ মোখ্‌তার সাহেবের উপস্থিতিতে একটি স্থানীয় চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে এক তবলীগি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত ছিলেন।

**সীরাতুন নবী (সাঃ) জলসাঃ**

১৮ই সেপ্টেম্বর '৯২দারুত তবলীগ হল রুমে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্মের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এক সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মচারী একান্ত চৈতন্য; কমলাপুর বৌদ্ধ বিহারের ধর্মরাজিক শ্রীমৎ কান্তিপাল ভিক্ষু; ঢাকা নটরডেম কলেজের উপাধ্যক্ষ ফাদার বেঞ্জামিন ডি কস্তা, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক শাহেদ আলী ও ঋতুপত্রের সম্পাদক আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী।

**খেদমতে খাল্‌কঃ**

গত ২৯শে অক্টোবরের ঘটনায় বেশ কয়েকজন খাদেমও গুরুতরভাবে আহত হয়। আহতদেরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগে ভর্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন এবং সার্বিক চিকিৎসার তত্ত্বাবধান ও আহতদের সর্বপ্রকার খেদমতের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক খাদেম সর্বদা উপস্থিত ছিলেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কর্তৃক কানাডার টরেন্টুতে উত্তর আমেরিকার সর্ব বৃহৎ মসজিদ বায়তুল ইসলাম এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ এক বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে। ফলে মসজিদের ছবিসহ স্থানীয় ইংরেজী ও বাংলা দৈনিক পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়।

গত ২৯শে অক্টোবরের আক্রমণ প্রসঙ্গে ৩১শে অক্টোবর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ কর্তৃক যে প্রেস কনফারেন্স আহুত হয় এর ব্যবস্থাপনায় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে। বিভিন্ন স্তরের লোকজনের সাথে যোগাযোগের ব্যাপারেও মজলিসের সদস্যগণ নানাভাবে অংশ গ্রহণ করে আসছে।

**লাজনা ইমাইল্লাহ বাংলাদেশঃ**

১৯৯২ সালে বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহর সদর সাহেবা ৩টি ও জেনারেল সেক্রেটারী সাহেবা ২টি জামা'তে সফর করেন।

খেদমতে খালকঃ– ঢাকা, বি–বাড়ীয়া, চট্টগ্রাম, শালগাঁও, উথলী, তেজগাঁও, আহমদনগর, ক্রোড়া ও কুমিল্লা জামাত রোগীদের শুশ্রূষা, গরীব মেয়েদের বিয়ে এবং গরীব ছাত্রীদের বই–পুস্তক ক্রয়ের জন্যে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছে এ সংগঠন।

ইজতেমাঃ ঢাকা কেন্দ্রীয় মসজিদ বাদেও সুন্দরবন, মীরপুর–ঢাকা, চট্টগ্রাম, ক্রোড়া ও কুমিল্লা জামা'তে যথারীতি বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে যে,এ সংগঠনের প্রচেষ্টায় কুমিল্লা জামা'তে ১০ জন এবং ঢাকা জামা'তে ৪ জন বোন বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হয়েছেন।

বিভিন্ন দিবস পালনঃ– সীরাতুন্নবী(সাঃ) জলসা, মসীহ মাওউদ (আঃ) দিবস ও মোসলেহ্ মাওউদ দিবস লাজনা ইমাইল্লাহর সংগঠনগুলো যথারীতি পালন করেছে। দুঃখের বিষয় যে, কোন কোন জামা'তের লাজনা সংগঠন মাসিক রিপোর্ট নিয়মিত কেন্দ্রে প্রেরণ করেন না। ২৯শে অক্টোবরে ঢাকাস্থ আহমদীয়া মুসলিম কমপ্লেক্সে হামলার পর জামা'তের নিরাপত্তার জন্যে লাজনার সদস্যরা রোযা রেখে দোয়ায় রত থাকেন এবং সাধ্যনুযায়ী আর্থিক কুরবানীও পেশ করেন। তাছাড়াও তাদের নিজ গৃহের খোদ্দাম, আতফাল, স্বামী ও পিতাদেরকে জামাতের প্রয়োজনে নিঃস্বার্থ সময়োপযোগী খেদমত করতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন। আহতদেরকে সাধ্যমত সেবা প্রদান করতেও চেষ্টা করে এ সংগঠন।

হুযূর (আইঃ)–এর তাহরীক অনুযায়ী অর্থসহ নামায পড়া, শুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও কুরআনের তর্জমা শিক্ষার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সে বিষয়ে বিশেষ সাড়াও পাওয়া গিয়েছে। লাজনা নিজেদের চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে খোদার ফযলে ক্রমোন্নতি লাভ করেছে। যেমন ১৯৮৮ সালে ১০,০০০/, (দশ হাজার) এবং ১৯৯২ সালে ২০,০০০/, (বিশ হাজার) টাকা চাঁদা আদায় হয়েছে।

## যাঁরা চির বিদায় নিয়েছেন

| নাম | জামা'ত | পদবী | তারিখ |
|---|---|---|---|
| মরহুম সাইদুল্লাহ শিকদার | নাটাই | প্রেসিডেন্ট | ৩-১-৯২ |
| মরহুম আবদুর রউফ | বি, বাড়ীয়া | – | ৯-১-৯২ |
| মরহুমা জোবেদা খাতুন | তারুয়া | – | ১২-১-৯২ |
| মরহুমা জিন্নাতুন নেসা খানম | আহমদ নগর | – | ২৩-১-৯২ |
| মরহুম মনিরুল হাসান সবুজ | তারুয়া | – | ২-২-৯২ |
| মরহুমা আইনক চান বিবি | বিষ্ণুপুর | – | ৫-২-৯২ |
| মরহুম এম এম আবদুর রউফ | রেকাবী বাজার | প্রেসিডেন্ট | ৮-২-৯২ |
| মরহুমা রেজিয়া খাতুন | কুমিল্লা | – | ১০-৩-৯২ |
| মরহুম এস, এম নাহিদুল ইসলাম | পটুয়াখালী | – | ৬-৪-৯২ |
| মরহুমা মজিদা পারভীন | সুন্দরবন | – | ৬-৪-৯২ |
| মরহুম জি, এম আলেরুদ্দিন | সুন্দরবন | – | ২-৫-৯২ |
| মরহুমা সিদ্দিকা খাতুন চৌধুরী | বি, বাড়ীয়া | – | ১১-৫-৯২ |
| মরহুম আবদুল জব্বার | বগুড়া | – | ২-৬-৯২ |
| মরহুম আতাউর রহমান | সিলেট | প্রেসিডেন্ট | ৩০-৬-৯২ |
| মরহুম আলহাজ্জ ক্যাঃ আঃ হোসেন | পার্বতীপুর | ঐ | ৩০-৬-৯২ |
| মরহুম ইসমাঈল আহমদ | তারুয়া | – | – – |
| মরহুমা রাবেয়া খাতুন | বি, বাড়ীয়া | – | ২১-৭-৯২ |
| মরহুমা জামেনা খাতুন | বিষ্ণুপুর | – | ২-৬-৯২ |
| মরহুম শামসুর রহমান মন্ডল | নিউ সোনাতলা | – | ৪-৯-৯২ |
| মরহুম সালাহ উদ্দিন খন্দকার | ঢাকা | – | ২০-৯-৯২ |
| মরহুম আঃ শুকুর হাজারী | ঘাটুরা | – | -- |
| মরহুমা মাহফুজা আক্তার মনি | সৈয়্যদপুর | – | ২২-৯-৯২ |
| মরহুমা রীতা | মহারাজপুর | – | ২২-৯-৯২ |

তালিকায় হয়তো কারো নাম বাদ পড়তে পারে। যাঁরা চলে গেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই সাধ্যমত ইসলামের খেদমত করে গেছেন। দোয়াতে আমরা তাঁদেরকেও শামিল রাখব। তা সত্ত্বেও জামাতে সেবার জন্যে যাঁরা উল্লেখের দাবী রাখেন তাঁরা হলেন সর্ব জনাব (১) সাইদুল্লাহ শিকদার, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নাটাই (২) মরহুম এম, এম, আবদুর রউফ, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রেকাবী বাজার (৩) মরহুম আতাউর রহমান,

প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সিলেট ও (৪) আলহাজ্জ ক্যাপটেইন ডাঃ আবুল হোসেন সাহেব, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, পার্বতীপুর।

তাছাড়া ঢাকা জামাতের মরহুম সালাহ উদ্দিন খন্দকার সাহেব বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন। তিনি ছিলেন জামাতের নিরলস খেদমতগার ও কুরআন প্রেমিক। তিনি অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করতেন। কুরআনের নতুন ব্যাখ্যা দানেও পটু ছিলেন তিনি।

আমরা সবারই মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁদের পরিবার পরিজনের প্রতিও আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

উপসংহারঃ– প্রনিধাণযোগ্য যে, বিজয় আল্লাহতা'লা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। বিজয়কে তরান্বিত করার জন্যে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ ও খেলাফতের প্রতি নিচ্ছিদ্র আনুগত্য রাখতে হবে। তাছাড়া ত্যাগ স্বীকার, ব্যাপক কর্মপ্রচেষ্টার সাথে সাথে তাক্ওয়া ও দোয়াকেও পাথেয় করতে হবে। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সবার সহায় হউন।

তারিখঃ ৩০শে মাঘ, ১৩৯৯
১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩

**মোহাম্মদ মোস্তফা আলী**
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

# আমাদের লংমার্চ

আলহাজ্জ এ, টি, চৌধুরী

সম্প্রতি বাংলাদেশের একদল মৌলবী মৌলানা লং মার্চ করেছেন। এই লং মার্চ ছিল ঢাকা থেকে যশোহর তক। অবশ্য তারা ঘোষণা দিয়েছিলেন অযোদ্ধায় গিয়ে বাবরি মসজিদ নির্মাণ করবেন বলে। আমাদের দেশের সাধারণ মুসলমানেরা মোল্লা মৌলবী সাহেবদেরকে অন্ধভাবে মানে। তাই কেউ প্রশ্ন করেনি—বৈধ ভিসা ছাড়া ভারতের অযোদ্ধায় যাবেন কি করে? বাবরি মসজিদ নির্মাণের জন্য ইট, পাথর, রড, সিমেন্ট কোথায়? রাজমিস্ত্রীরা কোথায়? না, কেউ এই সব প্রশ্ন উত্থাপন করেনি। কারণ উলামারা যা বলেন লোকেরা তো তাই চক্ষু বন্ধ করে সত্য বলে পালন করে। উলামাদের কথার পর আর কোন কিন্তু নেই।

লং মার্চ যশোহর থেকে কিছু দূরে গিয়ে বাঁধা প্রাপ্ত হল। পাঁচ জন সাধারণ মানুষ নিহত হল। কোন মৌলবী সাহেবের গায়ে সামান্য আঁচড় পর্যন্ত লাগল না। কারণ তারা নিরাপদ দূরত্বে ছিলেন। ফিরে এল লং মার্চ। ঢাকায় এসে সভা করে বল্লেন, আমাদের লং মার্চ চলবেই। আমরা কাদিয়ানীদেরকে দেখে ছাড়ব, ইত্যাদি। শান্তিপ্রিয় আহমদীদের বিরুদ্ধে 'লং মার্চ' করলে 'শহীদ' হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই এই 'লং মার্চ' নিরাপদ।

আমরা আল্লাহতা'লার কাছে শুকরিয়া জানাই এজন্য যে, সরকার এদেরকে বর্ডারতক যেতে দেন নি। খোদা না করুন, এরা বর্ডার অতিক্রম করতে চাইলে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর হাতে অন্ততঃ পাঁচ হাজার লোক নিহত হত। আহত হত আরো বেশী। আমরা নিহতের পরিবারের কাছে সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

বর্তমানে লং মার্চকারীরা আর অযোদ্ধায় যাবার কথা বলছেন না। তারা যশোহরে একটি বিকল্প 'বাবরি মসজিদ' নির্মাণ করেছেন। বাবরি মসজিদ নির্মাণের ওয়াদা তারা এভাবেই পূর্ণ করলেন। এই মসজিদ অযোদ্ধায় নয় যশোহরে? এই মসজিদ বাবর কর্তৃক নয় মৌলবী সাহেবদের দ্বারা নির্মিত হয়েছে ১৯৯৩ সালে। অথচ এর নাম 'বাবরি মসজিদ'।

এখন প্রশ্ন হল, আসল বাবরি মসজিদ যেখানে রাম মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে, পূজা হচ্ছে। সেই মসজিদকে আবাদ করবে কারা? ঐ মসজিদ কি নরসিমারাও বানিয়ে আবাদ করে দিবেন? তিনি কি রাম মূর্তি অপসারণ করবেন? ভারতের মুসলমানরা কি পারবে যুদ্ধ করে অযোদ্ধা দখল করে মসজিদ নির্মাণ করতে? কে দিতে পারে এর জবাব? উল্লেখ্য যে, বিগত ৪৫ বছর যাবৎ এই বাবরি মসজিদে নামায হয় নি। তাহলে উপায়? আমাদের মতে উপায় আছে। সেই উপায় হল, হুযুর (সাঃ) কর্তৃক কাবা শরীফ দখলের পন্থায় কাজ করতে হবে। কাবা শরীফ যুদ্ধ করে নয় আদর্শ দিয়ে জয় করা হয়েছিল। কাবা শরীফেও মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। ঐ সব মূর্তি তখনই ভাংগা হয়েছিল যখন একজন লোকও এসবের উপাসক ছিল না। তাই বাবরি মসজিদ দখল করতে চাইলে ভারতে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করতে হবে। অযোদ্ধার অধিকাংশ মানুষ যখন ইসলাম গ্রহণ করবে তখন বাবরি মসজিদ

আবাদ হবে। বর্তমানে অযোদ্ধায় ঐ মসজিদ আবাদ করার মত মুসলমান নেই। পাকিস্তান আর বাংলাদেশ থেকে নামাযি গিয়ে তো আর প্রতি ওয়াক্ত নামায পড়বে না, নামাযি ওখানেই পয়দা করতে হবে।

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত সমগ্র বিশ্বে মসজিদ নির্মাণ করছে। আমাদের জন্য সারা দুনিয়াটাই মসজিদ। তাই এই দুনিয়ার প্রতিটি অঞ্চল থেকে মিথ্যা মাবুদদের কল্পিত মূর্তি সরাতে হবে। সারা বিশ্বকে অযোদ্ধা অর্থাৎ যুদ্ধমুক্ত করতে হবে। তৌহীদের ঝাণ্ডা উড্ডীন করতে হবে সমগ্র জগতে। আর এই উদ্দেশ্যে নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত দিন রাত কাজ করে যাচ্ছে। একশত ত্রিশটি দেশে আজ এই জামা'তের প্রায় পাঁচ হাজার শাখা রয়েছে। শত ভাষায় অনূদিত হচ্ছে পবিত্র কোরআন, হাদীস। আহ্‌মদীয়া মুসলিম টি, ভি এর মাধ্যমে পাঁচটি মহাদেশে ইসলামের বাণী প্রচারিত হচ্ছে। আমাদের এই লংমার্চ চলছেই। চলবেও। দুনিয়ার কোন শক্তি আমাদের অগ্র যাত্রাকে রুদ্ধ করতে পারবে না। একশত বৎসরের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয়। আমরা সবাইকে ইসলামের এই লংমার্চে অংশ গ্রহণের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

## ধন্য কাফের (?)

আহ্‌মদ সেলবর্ষী

খোদার বিধান মানতে গিয়ে কাফের খেতাব পাবে যেজন,
জানাই তারে লক্ষ সালাম, সেই তো সফল, ধন্য সেজন।
পাক কলেমা পড়তে গিয়ে গলেতে যে শিকল পরে,
আযান ধ্বনি উচ্চারণে জেলখানায় যে ধুঁকে মরে,
এমন কাফের খোদার প্রিয়, মোমেনদের যে গৌরব ধন,
জানাই তারে লক্ষ সালাম, সেইতো সফল, ধন্য সেজন।
বিশ্ব নবীর দীনের তরে সব কিছু যে কুরবান করে
প্রচারিতে খোদার বাণী থাকে না যে বসে ঘরে।
সৃষ্টিকে যে ভালবাসে এমন কাফের উদার মন
জানাই তারে লক্ষ সালাম, সেইতো সফল, ধন্য সেজন।
কোরআন হাতে নানা দেশে দিনরাত যে সফর করে
শত ভাষায় বিলায় তাহা লক্ষ জনে দীনের তরে।
মানব প্রেমিক, বিশ্ব-সুহৃদ, সৃষ্টির সেরা কাফের এমন
জানাই তারে লক্ষ সালাম, সেইতো সফল, ধন্য সেজন।
বড় নবীর গোলাম হয়ে উঠে যে জন উর্দ্ধস্বরে,
এমন করে পায় যদি কেউ মোল্লার খেতাব কাফের ভীষণ
জানাই তারে লক্ষ সালাম, সেইতো সফল, ধন্য সেজন।
নবীকে যে ভালবাসে এই জগতে খোদার পরে
তাতে যদি কাফের হয় কেউ খোদার আশীষ তার উপরে।
সবার প্রিয় কাফের এমন সার্থক তার মানব জীবন
জানাই তারে লক্ষ সালাম, সেইতো সফল, ধন্য সেজন।

# সিয়াম সাধনা

—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

## ইসলামী ইবাদত

ইসলামী ইবাদতের দ্বিতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ রোকন বা স্তম্ভ হলো সিয়াম বা রোযা পালন। ইসলামী চান্দ্র বছরের নবম মাসের নাম রমযান। এ মাস ভরে রোযাব্রত পালনের বিধান দিয়েছেন আল্লাহ্‌তা'লা। রমযান মাসের পূর্ব নাম ছিল নাতেক (কাদীর)। প্রথমে যে বছর রোযা রাখার আদেশ এসেছিল তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। রোযার কারণে রোযাদার ক্ষুৎ পিপাসার জ্বালা অনুভব করে তাই এর নাম রোযা রাখা হয়েছে। রোযা 'রামাযা' মূল শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ তৃষ্ণায় উত্তপ্ত হওয়া, জ্বালিয়ে দেয়া ইত্যাদি। রমযান মাসের ইবাদত বন্দেগী মানুষের অভ্যন্তরস্থ পাপ ও ক্লেদকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয় আর স্রষ্টার প্রতি ভালবাসার উত্তাপ সৃষ্টি করে এমন কি সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতিরও উদ্রেক করে তাই রোযা বা সিয়াম সাধনা ইসলামের একটি বিশেষ অবদান।

## রোযার আদেশ

মহান আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন করীমে বলেন—ইয়্যা আয়্যুহাল্লাযীনা আমান্‌ কুতিবা আলায়কুমুস্‌ সিয়ামু কামা কুতিবা আলাল্লাযীনা মিন কাবলেকুম লা'আল্লাকুম তাত্তাকূন—হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্যে সিয়াম বা রোযাব্রত বিধিবদ্ধ করা হলো যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্যে বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল যেন তোমরা মুত্তাকী (খোদা-ভীরু) হতে পারো। (সূরা বাকারা: ১৮৪ আয়াত) এর পরবর্তী আরও ৫টি আয়াতে রোযার অন্যান্য বিধি-বিধান, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট লক্ষ্য সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। উপরোক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও বিভিন্ন জাতির মধ্যে রোযা বা উপবাসব্রত পালনের বিধান প্রচলিত ছিল। হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) বলেছেন—ফাসলু মা বায়না সিয়ামেনা আহ্‌লেল কেতাবে আকালাতুস্‌ সাহারে—আমাদের এবং আহলে কেতাবদের রোযার মধ্যে পার্থক্য হলো সেহরী খাওয়া। (মুসনাদ দারিমী বাবু ফযলুস্‌ সাহুর: ১৭৪ পৃষ্ঠা)। এ থেকেও বুঝা যায় যে, আহলে কেতাবদের মধ্যে রোযার প্রচলন ছিল। হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন তিথিতে উপবাসব্রত পালনের প্রচলন আমরা এখনও দেখতে পাই।

## রোযার উদ্দেশ্য

সিয়াম 'সাওম' মূল শব্দ থেকে উদ্ভূত যার অর্থ বিরত থাকা। শরীয়তের বিধান মতে সুবহে সাদেক অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত সময়ে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ থেকে এবং স্বামী-স্ত্রী ব্যবহার থেকে বিরত থাকার নাম সিয়াম বা রোযা ব্রত। (সূরা বাকারা: ১৮৮ আয়াত) রোযার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ বলেছেন—যেন মোমেনগণ তাক্‌ওয়া

লাভ করতে পারে। আল্লাহ্‌ তা'লার সন্তুষ্টির জন্যে মোমেনগণ নির্দিষ্ট সময় পানাহার ও স্ত্রী-গমন পরিত্যাগ করে, যদিও তা বৈধ এবং জীবন ধারণ ও প্রজন্ম রক্ষার খাতিরে অতীব জরুরী। আল্লাহ্‌র আদেশে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করার লক্ষ্যে যারা হালাল ও বৈধ জিনিসকে যখন পরিত্যাগ করতে পারে তখন আল্লাহ্‌ তা'লা কর্তৃক নিষিদ্ধ কার্যকলাপ থেকে যে তারা বিরত থাকতে পারবে তা বলাই বাহুল্য। তাই রোযা মানুষের মধ্যে সেই প্রবণতা সৃষ্টি করে যদ্বারা মানুষ পাপ থেকে বেঁচে যায় এবং সেক্ষেত্রে রোযা ঢাল স্বরূপ কাজ করে। যেহেতু রোযা একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লার উদ্দেশ্যেই রাখা হয় তাই হুযুর (সাঃ) বলেছেন—কুল্‌ আমালেব্‌নে আদামা লাহ্‌ ইল্লাস্‌ সিয়ামু ফা ইন্নাহ্‌ লী ওয়া আনা আজ্‌যী বিহী ওয়াস্‌ সিয়ামু জুন্নাতুন—অর্থাৎ (আল্লাহ্‌ বলেন) আদম সন্তানের সব কাজ তার নিজের জন্যে কিন্তু রোযা আমার জন্যে। আর তাই আমি নিজেই এর পুরস্কার এবং রোযা ঢাল স্বরূপ (বুখারী কিতাবুস্‌ সাওম)।

যুগ-ইমাম হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) রোযার গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন—"অল্প আহার ও ক্ষুধা সহ্য করাও আত্মশুদ্ধির জন্যে আবশ্যক। এতে দিব্য-দর্শন-শক্তি বৃদ্ধি পায়··· খোদার অভিপ্রায় একটি খাদ্যকে কম করে অপর একটি খাদ্যকে বৃদ্ধি করা। রোযাদারকে সর্বদা এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া কর্তব্য। খোদাতা'লার যিক্‌র ও স্মরণের মধ্যেই সময় কাটানো উচিত যেন সংসারের মোহ দূর হয় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করা হয়। অতএব রোযার উদ্দেশ্য ইহাই যে, মানুষ যেন এক খাদ্য ত্যাগ করে অন্য খাদ্য গ্রহণ করে যা আত্মার প্রশান্তি ও তৃপ্তির কারণ হয়। যে লোক শুধু খোদার উদ্দেশ্যেই রোযা রাখে; আচার অনুষ্ঠানের রোযা রাখে না তার কর্তব্য সে যেন সর্বদা আল্লাহ্‌তা'লার হামদ তসবীহ এবং তাহলীলের অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রশংসা, তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা ও তাঁর তৌহীদের ঘোষণার মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। যাতে তার দ্বিতীয় খাদ্য অর্থাৎ আধ্যাত্মিক খাদ্যের সৌভাগ্য লাভ হয়।" (আল হাকাম, ১৭-১-১৯০৭)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আওয়াল (রাঃ) রোযার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন—"যে ব্যক্তি রোযার মধ্যে নিজের জিনিসসমূহ খোদার জন্যে পরিত্যাগ করে যেগুলো ভোগ করা তার জন্যে নীতিগতভাবে এবং চারিত্রিক দিক দিয়ে অন্যায় নয় তাহলে এতে তার এ অভ্যেস গড়ে উঠে যে, সে অন্যদের জিনিষ-পত্র অবৈধভাবে ভোগ করে না এবং ওগুলোর প্রতি তাকায়ও না। আর যখন সে খোদার জন্যে বৈধ জিনিষগুলো পরিত্যাগ করে তাহলে তার দৃষ্টি অবৈধ জিনিষের প্রতি পড়তেই পারে না"। (আল ফযল: ১৭-১২-৬৬, পৃষ্ঠ-৮)

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) রোযার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন—"রমযানের আসল উদ্দেশ্য এই যে, এই মাসে মানুষ খোদার জন্যে সব কিছু ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। তার অভুক্ত থাকা এ কথার চিহ্ন ও নিদর্শন হয় যে, সে তার প্রত্যেকটি অধিকার খোদার

জন্যে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। খাদ্য ও পানীয় মানুষের অধিকার, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও তাদের অধিকার। এজন্যে যে ব্যক্তি এসব কিছুকে পরিত্যাগ করে সে একথা বলে যে, আমি খোদার জন্যে নিজের সব কিছু ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। অবৈধ জিনিষ ছেড়ে দেয়া তো সামান্য কথা আর কোন মোমেন থেকে এ প্রত্যাশাও করা যায় না যে, সে কারও অধিকার খর্ব করে। মোমেনের নিকট যে প্রত্যাশা তা হলো এই যে, খোদাতা'লার সন্তুষ্টির জন্যে সে তার বৈধ অধিকারকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু যদি রমযান আগমন করে আর তখনি শেষ হয়ে যায় আর আমরা বলি যে, আমরা কিভাবে আমাদের অধিকার ছেড়ে দেই তাহলে এর উদ্দেশ্য ইহাই যে, আমরা রমযান থেকে কিছুই পাই নি কেননা রমযান এ কথা শিখাতে এসেছিল যে, খোদার সন্তুষ্টির জন্যে নিজের ন্যায্য অধিকারও ছেড়ে দেয়া উচিত।" (আল ফযল, মার্চ্চ ১৯২৬, ৫-৬ পৃষ্ঠা)।

মোট কথা একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টির জন্যে রোযাদার তার জন্যে বৈধ পানাহার ও স্ত্রী-সম্ভোগ জাতীয় কাজগুলোকে পরিত্যাগ করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। দিনের বেলায় সে এসব কাজ থেকে বিরত থেকে রাত্রটাকে ইবাদতের মাধ্যমে জাগ্রত রাখে অন্য অর্থে সে তার মধ্যে আল্লাহ্‌র সিফ্‌ত (গুণাবলী) আনয়নের চেষ্টা করে, খোদার গুণে গুণান্বিত হওয়ার চেষ্টা করে। মহান আল্লাহ্‌ খাবার খান না, তাঁর পিপাসা লাগে না। বংশ বৃদ্ধির জন্যে তাঁর প্রজননেরও প্রয়োজন নেই। এমনকি তিনি নিদ্রা ও তন্দ্রামুক্ত। তাঁর বান্দা এ নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঐ কাজগুলো পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌তা'লার গুণাবলীর প্রকাশক হওয়ার জন্যে সিয়াম বা রোযার মাধ্যমে সেই সাধনাই করে থাকে। সে আল্লাহ্‌র মহান গুণাবলীর জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে প্রথমে নীতিবান মানুষ ও পরে আল্লাহ্‌ওয়ালা মানুষে পরিণত হবার চেষ্টা করে। ফলতঃ এবাদতের মূল লক্ষ্যও তাই। বান্দার এহেন কার্যক্রমের ফলে বান্দা প্রভুর খুবই নিকটবর্তী হয়ে যায় আর তখন উভয়ের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান মোকালেমা-মোখাতাবা হয়। বান্দা আল্লাহ্‌তে বিলীন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। আর সঠিক পথ লাভ করার সৌভাগ্য পায়। সূরা বাকারার ১৮৭ আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

এখানে উল্লেখ থাকে যে, রোযার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আরও অনেক দিক রয়েছে যা বর্ণনা করা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয় বিধায় এখানেই বিরত থাকলাম।

## রোযার কতিপয় তথ্যগত বিষয়াদি ঃ

### রোযার প্রকার ভেদ ঃ

ক) ফরয (অবশ্য করণীয়) রোযা—যেমন (১) রমযানের রোযা, (২) রমযানের কাযা রোযা, (৩) যিহার (স্ত্রীর পিঠকে মায়ের পিঠের মত বলা)-এর কাফ্‌ফারা হিসেবে রোযা, (৪) খুনের কাফ্‌ফারার রোযা, (৫) ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের রোযা ভঙ্গ করার শাস্তি হিসেবে ৬০টি রোযা, (৬) কসম খাওয়ার কাফ্‌ফারা হিসেবে রোযা, (৭) মানতের রোযা,

(৮) তামাত্তো হাজ্জ অথবা কিরান হজ্জের রোযা, (৯) এহরাম অবস্থায় স্বীকার করার কাফ্ফারা হিসেবে রোযা এবং (১০) এহরাম অবস্থায় মাথা মুড়ানোর কাফ্ফারা হিসেবে রোযা।

**নফল (অতিরিক্ত) রোযা ঃ** (১) শাওয়াল মাসের ৬ রোযা, (২) আশুরার রোযা, (৩) দাউদ (আঃ)-এর রোযা যেমন একদিন রোযা রাখা ও পরের দিন রোযা না রাখা, (৪) আরাফাতের দিন রোযা রাখা, ও (৫) প্রত্যেক ইসলামী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা।

**যেসব দিনে রোযা হারাম (নিষেধ) ও মকরূহ (ঘৃণীত) ঃ** (১) কেবল বৃহস্পতিবার বা শুক্রবার বিশেষভাবে রোযা রাখা, (২) সারা বছর ধরে রোযা রাখা ও (৩) আইয়ামে তাশরীক অর্থাৎ ১১-১৩ই জিলহজ্জ এবং দুই ঈদের দিন রোযা রাখা। (সূত্র-ফেকাহ্ আহমদীয়া : ২৭২ পৃষ্ঠা)

**কাদের জন্যে রোযা ফরয ঃ**

রমযানের রোযা প্রত্যেক বালেগ, বুদ্ধিমান, সুস্থ, মুকীম (যিনি বাড়ীতে অবস্থান করছেন) মুসলমান নর ও নারীর জন্যে ফরয। মোসাফের ও রুগ্ন ব্যক্তিদেরকে এথেকে অবকাশ দেয়া হয়েছে। তারা অন্য সময়ে এ দিনগুলো অর্থাৎ যে দিনগুলোতে তারা রোযা রাখা থেকে অবকাশ পেয়েছেন পুরো করবেন (সূরা বাকারা : ১৮৬ আয়াত)। ঋতুবতী এবং সদ্য সন্তান প্রসব করেছে এমন মহিলারা রোযা পরে পুরো করবেন। গর্ভবতী মহিলা ভ্রূণের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকলে এবং প্রসূতি মা সন্তানের দুধের অভাবের আশংকায় নির্দিষ্ট দিনগুলোর রোযা পরে পুরো করবেন। অসুস্থতা বা অন্য কারণে রোযা রাখা যাদের সাধ্যাতীত তাদেরকে ফিদিয়া দেয়ার জন্যে আদেশ দেয়া হয়েছে (সূরা বাকারা : ১৮৫ আয়াত)। ফিদিয়া হলো মিসকীনকে স্থান-কাল ভেদে সাধ্যমত খাদ্য দান। নেযামে জামাতের মাধ্যমে ফিদিয়া আদায় করার বিধান রয়েছে সেলসেলা আলীয়া আহমদীয়ার মধ্যে। তবে রোযা রাখাই সর্বোত্তম যেন-না এতে অফুরন্ত কল্যাণ রয়েছে।

**রোযা কখন রাখবেন ঃ** পূর্বেই বলেছি সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব সময় পর্যন্ত রোযা রাখতে হবে। রমযানের রোযা রমযান মাস ভরে রাখতে হবে। রমযানের চাঁদ উঠেছে দেখলে বা উঠেছে বলে জানা গেলে পরের দিন থেকে রোযা রাখতে হবে। কোন কারণে রমযানের চাঁদ না দেখা না গেলে বা চাঁদ উঠেছে বলে জানা না গেলে শা'বান মাসের ৩০ দিন হিসেব করে রোযা রাখতে হবে (বুখারী)। রমযানের চাঁদ দেখে রোযা রাখতে হবে আর শাওয়ালের চাঁদ দেখে রোযা ছাড়তে হবে (বুখারী)। রমযানের চাঁদ দেখার খবরকে যাচাই করার জন্যে একজন বিশ্বাসযোগ্য ন্যায়-বিচারক ব্যক্তির সাক্ষ্য যথেষ্ট। ইফতার ও ঈদুল ফিতরের জন্যে কমপক্ষে ঐরূপ দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য যথেষ্ট। রেডিওর খবরও বিশ্বাসযোগ্য তবে শর্ত এই যে, চাঁদ দেখার স্থান ও খবরের স্থানের দিগন্ত এবং উদয়ের স্থান একই হতে হবে নচেৎ এ খবরের ওপর আমল করা যাবে না। অর্থাৎ যদি

দুই স্থানের দূরত্ব অনেক বেশী হয় যেমন বৃটেন ও বাংলাদেশ তাহলে এ ধরনের খবরের ওপর আমল করা যাবে না। (ফেকায়ে আহমদীয়া : ২৭৪ পৃঃ)

## রোযার জন্য নিয়্যত করা জরুরী ঃ

আঁ-হযরত (সাঃ) বলেছেন—মান লাম ইয়াজমায়েস্ সাওমা কাবলাল ফাজরে ফালা সিয়ামা লাহু—অর্থাৎ যে সুবহে সাদেকের (সূর্য ওঠার পূর্বে) পূর্বে রোযার নিয়্যত না করে তার কোন রোযা নেই। (তিরমিযী কেতাবুস্ সাওম) সুতরাং রোযা রাখার নিয়্যত করা খুবই জরুরী।

## সেহরী খাওয়া ও ইফতারের সময় ঃ

আঁ-হযরত (সাঃ) বলেছেন—তোমরা সেহরী খাও কেন-না এতে কল্যাণ রয়েছে। (বুখারী) কুরআন বলে—পানাহার কর যে পর্যন্ত সাদা সুতো কাল সুতো থেকে তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট না হয় অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের নিকটি উষার শুভ্ররেখা কৃষ্ণরেখা থেকে পৃথক দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর রাত্র (আগমন) পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। (সূরা বাকারা ঃ ১৮৮ আয়াত ও বুখারী) হুযূর (সাঃ) আরও বলেছেন—যতদিন মানুষ শীঘ্র শীঘ্র (অর্থাৎ সময় হলেই) ইফতার করতে থাকবে ততদিন তারা উন্নতির পথে থাকবে। (বুখারী) কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত বর্ণনা থেকে আমরা সেহরী ও ইফতারীর সময় নির্ণয় করতে পারি। আবহাওয়া অফিস থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের যে সময় ঘোষণা করা হয় তার ওপরে ভিত্তি করে সময় নির্ণয় করলে বিভ্রান্তি ও মতভেদের সম্ভাবনাকে এড়ানো যেতে পারে। এত সব স্পষ্ট নির্দেশাদি থাকা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই সেহরী খাওয়া ও ইফতার করা নিয়ে বিভিন্ন ক্যালেণ্ডার প্রকাশ করা হয়। কারও মতে ৩/৪ মিনিট বেশী কারও মতে ৩/৪ মিনিট কম বা আরও অন্য রকম। এ যেন খোদাকে জোর করে সন্তুষ্ট করার মত আর কি? ইদানিং এ নিয়ে বেশ মতভেদও জমে ওঠেছে।

## কি কি কারণে রোযা ভঙ্গ হয় ঃ

হুযুর (সাঃ) বলেছেন—যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও আচরণ বর্জন করে না আল্লাহ্র কোনই প্রয়োজন নেই যে, সে (অযথা) পানাহার থেকে বিরত থাকে (বুখারী)। প্রকৃতপক্ষে রোযাদার উপরোক্ত সতর্কবাণীর ওপরে আমল না করে রোযা রাখলে তার রোযা আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হয় না আর তার রোযা না রাখারই শামেল। এছাড়া নিম্নলিখিত কারণে রোযা ভঙ্গ হয় : (১) জ্ঞাতসারে পানাহার করলে ও স্ত্রীগমন করলে, (২) রক্তক্ষরণ করলে, (৩) ইনজেকশন নিলে, এবং (৫) ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে। অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে রোযা ভঙ্গ হয় না। জ্ঞাতসারে রোযা ভঙ্গ করলে কাযা রোযা ব্যতিরেকে শাস্তি স্বরূপ ক্রমাগত ৬০টি রোযা রাখতে হবে।

## কি কি কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না ঃ

ভুলে পানাহার করলে (বুখারী)। যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে গলা বা পেটে ধোঁয়া, ধুলা, মাছি, মশা, কুলি করার সময় সামান্য পানি চলে যায় তবে রোযা ভঙ্গ হয় না। এভাবে কানে পানি গেলে অথবা ঔষধ দিলে, শ্লেষ্মা বের হলে, বা স্বভাবিকভাবে ঢোক গিললে, অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হলে, চোখে ঔষধ দিলে, গরমের প্রকোপে নাক দিয়ে রক্ত বের হলে, দাঁত থেকে রক্ত বের হলে, বসন্তের টিকা নিলে, মেসওয়াক বা ব্রাশ করলে, সুগন্ধ নিলে, নাকে ঔষধ দিলে, মাথায় ও দাড়ীতে তৈল দিলে, শিশু বা বিবিকে চুমু খেলে, দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হলে, অসুবিধার কারণে সেহরীর সময় ফরয গোসল না করতে পারলে রোযা ভঙ্গ হয় না। দিনের বেলায় মেয়েরা সুরমা লাগাতে পারে। পুরুষদের বেলায় আঁ-হযরত (সাঃ) বলেছেন, হে প্রিয়গণ! রোযার দিনে সুরমা লাগিও না। রাতের বেলা অবশ্যই লাগাতে পারো। (মুসনাদ দারিমী) হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন—দিনের বেলা সুরমা লাগানোর দরকারই বা কি? রাতে লাগাও। (বদর: ৭-২-১৯০২)

(উপরোক্ত মসলার জন্যে ফেকায়ে আহমদীয়াতের ২৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

## সফরে রোযা রাখার সম্বন্ধে বিধান ঃ

আল্‌কুরআনের বিধান পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আল্‌কুরআনে বলা হয়েছে 'আন্‌-তাসুম্‌ খায়রুল্লাকুম' অর্থাৎ রোযা রাখাই তোমাদের জন্যে উত্তম। সফরে রোযা রাখা সম্বন্ধে আঁহযরত (সাঃ) বলেছেন—ফাকালা লায়সা মিনাল বের্‌রেস্‌ সাওমু ফিস্‌ সাফরে অর্থাৎ সফরে রোযা রাখা পুণ্যের কাজ নয় (বুখারী)। তিনি কোন কোন সফরে রোযা রাখতেও বলেছেন বলে আমরা হাদীস পাঠে জানতে পারি। সফরে রোযা না রাখাই উচিত তবে অবস্থার প্রেক্ষিতে রোযা রাখাও যেতে পারে যেভাবে ফেকায়ে আহমদীয়াতে বলা হয়েছে (২৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। মোদ্দা কথা এই যে, (১) যদি হেঁটে বা যান-বাহনে সফর আরম্ভ হয় এবং পথ চলতেই হয় তবে রোযা রাখা যাবে না কেন-না ঐ অবস্থায় রোযা ছেড়ে দেয়াই জরুরী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) সফরে রোযার বিষয় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "যদি রেলের সফর হয়, কোন প্রকারের কষ্ট না হয় তাহলে রোযা রেখে নাও নচেৎ খোদাতা'লার দেয়া অবকাশ থেকে উপকৃত হও"। (আল হাকাম: ২৪-১২-১৯০০) (২) সফরের অবস্থায় যদি কোথাও রাতে অবস্থান করতে হয় এবং যদি সুবিধা থাকে তবে রোযা রাখা যেতে পারে অর্থাৎ রোযা রাখা বা না রাখা উভয়েরই অনুমতি আছে কেন-না সারা দিন সেখানে অবস্থান করতে হবে।

(৩) সেহরী খেয়ে ঘর থেকে রওয়ানা হলে এবং ইফতারীর পূর্বে সফর শেষ হলে অর্থাৎ ঘরে ফিরে আসার সম্ভাবনাই অধিক থাকলে রোযা রাখা যাবে।

(৪) যদি কোন স্থানে ১৫ দিন অথবা এর চেয়েও অধিক দিন অবস্থান করতে হয় আর সেখানে সেহরীর ব্যবস্থা করা যায় তবে রোযা রাখা যাবে।

## অসুস্থ অবস্থায় রোযা পালন ঃ

অসুস্থ অবস্থায় রোযা রাখা থেকে আল্ কুরআন অবকাশ দিয়েছে। সুস্থ হলে তবে তা পূরো করার বিধান দিয়েছে। আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্যেই রোযা, সুতরাং অসুখের বাহানা করে যেন রোযা থেকে কেউ বিরত না থাকেন তাও দেখতে হবে।

## রোযা রাখার বয়স ঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলেন—"আমার মতে রোযার আদেশ ১৫-১৮ বছর বয়স থেকে শুরু হয়। আর ইহাই সাবালক হওয়ার সীমারেখা। ১৫ বছর বয়স থেকে রোযা রাখার অভ্যেস করান দরকার এবং ১৮ বছর বয়েসে রোযা রাখা অবশ্য কর্তব্য মনে করা দরকার"—(আল ফযল ঃ ২-২-১৯৩৩)। যখন পুরুষ বা মহিলা অধিক বয়স হওয়ার কারণে রোযা রাখতে অপারগ হয়ে যায় তারা রোযা রাখার পরিবর্তে সামর্থ্যানুযায়ী ফিদিয়া আদায় করবেন। সামর্থ্য না থাকলে দোয়া করতে থাকবেন। রোযার আরও বিভিন্ন দিক রয়েছে যা বর্ণনা করার অবকাশ এ স্বল্প পরিসরে নেই।

সবশেষে একথা বলা বোধ করি বাহুল্য হবে না যে, রোযা আমাদের জন্যে বোঝা নয়। আত্মাকে শক্তিশালী করার জন্যে এবং আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ প্রবাহে অবগাহন করার জন্যে রোযার বিধান মহান আল্লাহ্‌তা'লার একটি মহাদান। আমাদের সকলের এ দান থেকে উপকৃত হওয়াকে সৌভাগ্য মনে করা উচিত।

---

## মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপিত

২০শে ফেব্রুয়ারী আহমদীয়াতের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল দিন। ১৮৮৬ সনের এ দিন ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) দীর্ঘ চল্লিশ দিন হুশিয়ারপুরে চিল্লা কশি করার পর ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের স্বপক্ষে সাহায্য ও সমর্থন লাভের লক্ষ্যে আল্লাহ্‌তা'লার কাছ থেকে এক মহান পুত্রের জন্মের শুভ সংবাদ লাভ করেন। তিনি সবুজ ইশতেহারের মাধ্যমে ৫২টি আলামত সম্বলিত ঐ ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করেন। ১৯৪০ সনের ২০শে জানুয়ারী হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) নিজেকে সেই প্রতিশ্রুত পুত্র তথা মুসলেহ্ মাওউদ বলে ঘোষণা দেন।

অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও সমগ্র বাংলাদেশের স্থানীয় জামাতগুলো অতি শান ও শওকতের সাথে এ দিনটি পালন করে। এ পর্যন্ত যেসব জামাত থেকে রিপোর্ট পাওয়া গেছে তারা হলেন ঃ ঢাকা, আহমদনগর, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ঘাটুরা জামাত। আল্লাহ্‌তা'লা তাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

আহমদী বার্তা

---

## সংশোধনী

অত্র সংখ্যা পাক্ষিক আহমদীর ৩৪ পৃষ্ঠায় 'ধন্য কাফের' নামক কবিতার ১৬ লাইনে নিম্নোক্ত পদটি পড়তে হবে। এ অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্যে আমরা দুঃখিত।

"নবীর প্রেমে বিভোর হয়ে পড়ে দরূদ নবীর পরে"

# ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রঃ মানবধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য

যতীন সরকার

বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পর বিরোধী কিংবা একে অন্যের পরিপূরক কি-না, সে নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে বিতর্ক চলে আসছে, ভবিষ্যতেও সম্ভবত বহুকাল সে বিতর্কের ধারা প্রবহমান থাকবে। বিজ্ঞানীর পক্ষে বস্তুবাদী হওয়াই হয়তো স্বাভাবিক। কারণ বস্তুজগতের কার্যকারণ সম্পর্ক নিয়েই বিজ্ঞানীর কারবার। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার বিস্ময়রহস্য যত উন্মোচিত হচ্ছে ততোই বস্তুবাদী দর্শনের সমৃদ্ধি ঘটছে, ভাববাদের সকল যুক্তি বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। আগামী দিনের বিজ্ঞান হয়তো বস্তুবাদেরই দৃঢ় প্রতিভা দান করবে, ভাববাদকে পুরোপুরিই অচল করে দেবে।

তবে, আগামী দিনের কথা আগামী দিনেই বিচার্য হবে। এখন পর্যন্ত কিন্তু জীবন চিন্তায় ভাববাদী দর্শনের অনুসারী বিজ্ঞানীর সংখ্যা মোটেই কম নয়। জেমস জিনস ও এডিংটনের মতো খ্যাতনামা বিজ্ঞানী তো ভাববাদের সপক্ষে প্রচুর যুক্তিতর্কেরই অবতারণা করেছেন। ভাববাদী দর্শন নয় শুধু আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি প্রকাশ্য অনুরাগও অনেক অনেক বিজ্ঞানীই প্রকাশ করে থাকেন। আমাদের উপমহাদেশের দুই প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি। একজন উনিশ শতকের মানুষ জগদীশ চন্দ্র বসু অন্যজন ত্রিশ শতকের আবদুস সালাম। পদার্থ বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের কৃতী সাধক জগদীস চন্দ্র ধর্ম সাধনারও পরম অনুরাগী ছিলেন। ব্রাহ্মমতাবলম্বী জগদীশ চন্দ্র তাঁর বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পাশেই নাকি নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসনার জন্য স্থান নির্দিষ্ট রেখেছিলেন। আর এযাবৎকালের নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের মধ্যে একমাত্র মুসলমান বিজ্ঞানী আবদুস সালাম যদিও তাঁর নিজের দেশ পাকিস্তান মুসলমান বলে স্বীকার করে না ( কারণ সালাম সাহেব যে সম্প্রদায়ের মানুষ সেই আহমদীয়া সম্প্রদায়কে পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে ), তবু সালাম নিজেকে ধার্মিক মুসলমান রূপে পরিচিত করে গর্ববোধ করেন। ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা পালনেও তিনি একান্ত নিষ্ঠাবান।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে কোন প্রকৃত বিজ্ঞানী ভাববাদী আধ্যাত্মবাদী কিংবা আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালনে একান্ত নিষ্ঠাবান হতে না পারলেও ধর্মান্ধ মৌলবাদী অথবা কট্টর সাম্প্রদায়িকতাবাদী হতে পারেন কি? এর স্পষ্ট উত্তর : না, কিছুতে না, কোনোমতেই না। বিজ্ঞানীকে অবশ্যই যুক্তি নির্ভর হতে হয়, তাই ধর্মান্ধ হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সদা পরিবর্তনশীলতাই বিশ্বের সকল কিছুর অপরিহার্য ধর্ম। সকল বিজ্ঞানীই এ সত্য সম্পর্কে অবহিত, তাই মৌলবাদী তারা হতে পারেন না। আর বিশ্বজনীন সত্য আবিষ্কারই যেখানে বিজ্ঞানের আসল লক্ষ্য সেখানে কোন প্রকৃত বিজ্ঞানী কী করে সাম্প্রদায়িক ভাবনার

বৃত্তে আবদ্ধ থাকবেন ? কট্টর সাম্প্রদায়িকতাবাদী তথা কূপমণ্ডুক হবেন ? মানুষের কূপমণ্ডুক অবস্থানকে বিধ্বস্ত করে দিতে বিজ্ঞানীরাই তো সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রেখেছেন। সে ভূমিকায় ধার্মিক বিজ্ঞানী আবদুস সালামের অবস্থানও একান্ত সুসঙ্গত, অবিচল ও নিরলস। সে ভূমিকা পালন করতে গিয়েই তিনি ধর্মধ্বজী কূপমণ্ডুকতার নির্ভীক সমালোচক। মৌলবাদী ভাবনা-চিন্তার বিরুদ্ধেও তিনি দৃঢ় অবস্থান নিয়ে দণ্ডায়মান। 'যার চিত্ত অনবরত অনুসন্ধানে জ্বলতে থাকে সেই প্রকৃত মুসলমান'—কবি ইকবাল কথিত এই প্রকৃত মুসলমানত্বের অনুসারী বলেই বিজ্ঞানী আবদুস সালাম বিজ্ঞান—সাধনা দিয়ে মৌলবাদকে প্রতিহত করেন। পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব সম্পর্কে নতুন তত্ত্ব তাঁর চেতনায় জাগ্রত হচ্ছে ; সে তত্ত্ব ধর্মশাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ কি-না, ধার্মিক হয়েও বিজ্ঞানী বলেই তা নিয়ে আবদুস সালামের মাথা ব্যথা নেই। নির্ভেজাল সত্য সন্ধানই বিজ্ঞানীর মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যের প্রতি মুসলিম দেশগুলো যে অবিচলিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারছে না, বৈজ্ঞানিক সত্যের চেয়ে ধর্মীয় মৌলত্বকেই যে তারা বেশী মূল্য দেয় এর জন্য বিজ্ঞানী সালামের ক্ষোভের অন্ত নেই।

সম্প্রতি 'আহ্বান' নামক একটি মাসিক পত্রে ( ঢাকা, নভেম্বর—ডিসেম্বর ১৯৯২ ) আবদুস সালামের 'ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা : শান্তির ভিত্তি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পড়লাম। প্রবন্ধটি ১৯৮৪ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর ইটালির রোমে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কীয় দ্বিতীয় বিশ্ব কংগ্রেসে সালাম সাহেব প্রদত্ত ভাষণের অংশ বিশেষের বঙ্গানুবাদ। ভাষণটি শুরু হয়েছে এভাবে :

"শুরুতেই আমি বলে দিতে চাই যে, আমি এখানে একজন প্রকৃত মুসলমান বৈজ্ঞানিক হিসেবে আমার বক্তব্য পেশ করছি। একজন মুসলমান হিসেবে ধর্মীয় বিশ্বাস ও কাজের স্বাধীনতা আমার নিকট খুবই প্রিয়, যেহেতু পরমত সহিষ্ণুতা ইসলামী ধর্ম বিশ্বাসের একটি অপরিহার্য অংশ। অন্যদিকে একজন পদার্থবিদ হিসাবে এই বিশ্বাসও আমার নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রত্যেক সমাজে ধর্মীয় কাজে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক আলোচনার স্বাধীনতাকেও নিশ্চিত করতে হবে। কেননা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে বিরুদ্ধ মত ও ধারণার প্রতি সহিষ্ণুতা একান্তই অপরিহার্য বিষয়।"

এ কথাগুলো বলার পর সালাম সাহেব ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রসংগে কুরআন শরীফের ছয়টি আয়াতের ও মহানবীর পবিত্র জীবন থেকে তিনটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। 'ধর্ম বিষয়ে কোন জোরজবরদস্তি নাই' কিংবা 'বল, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত। সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক আর যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখান করুক'—এ রকম আয়াতগুলোর সংগে পরিচয় থাকা সত্ত্বেও যারা ধর্মধ্বজী তারা এ সবের আমল করার উপর কোনো গুরুত্ব না দিয়ে ধর্মকে নিজেদের মতলব উদ্ধারেরই কাজে লাগায়—এ রকম তো আমরা প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করছি। মহানবীর জীবনের দৃষ্টান্তগুলো অনুসরণ করলে কেউই যে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী হতে পারে না এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানী সালামের বক্তৃতায় উল্লেখিত এ রকমই একটি দৃষ্টান্ত :

"একবার নাজরান থেকে একদল খৃষ্টান প্রতিনিধি মদিনায় নবীজীর নিকট আলাপ আলোচনার জন্য আসে। মদিনার মসজিদে নববীতে দীর্ঘক্ষণ ধরে ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়। নবীজী দৃঢ়তার সঙ্গে এই আদেশ প্রদান করেন যে, নাজরানের খৃষ্টানদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে স্বীয় মর্যাদায় অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত রাখা হবে। সভা চলাকালীন সময়ে খৃষ্টান প্রতিনিধিরা প্রার্থনার জন্য কিন্তু সময়ের বিরতি কামনা করেন। তবে প্রার্থনার জন্যে তারা কোথায় যাবেন এ নিয়ে তাদেরকে একটু উৎকণ্ঠিত মনে হলো। এতদ্দর্শনে নবীজী তাদেরকে মসজিদে নববীতে প্রার্থনা করার জন্য আহ্বান জানালেন।"

ঘটনাটির উল্লেখ করে সালাম সাহেব মন্তব্য করেছেন "এই মসজিদে নববী ইসলামে অন্যতম সম্মানের স্থান হিসেবে চিহ্নিত। একটি বিধর্মের লোকদিগকে উপাসনার জন্য নিজ মসজিদের স্থান দিয়ে নবীজী উদারতা, মহানুভবতা, ও পরমত সহিষ্ণুতার যে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তাই পরবর্তীকালে ইসলামী মূল্যবোধ ও আদর্শ হিসেবে ইসলামী কর্মকাণ্ডকে পরিচালিত করেছে।"

অথচ, এরকম মূল্যবোধ ও আদর্শের বিপরীত কর্মকাণ্ডই যদি প্রত্যক্ষ করতে হয় সমকালীন সমাজে তবে সালাম সাহেবের মতো ধার্মিক বিজ্ঞানী কি মর্মাহত না হয়ে পারেন। মর্মাহত হতে হয় বিজ্ঞানীর মতো কবিকেও। জীবনদৃষ্টিতে ভাববাদী বা বস্তুবাদী যা-ই হোন না কেন, কবিমাত্রই অতিমাত্রায় সংবেদনশীল। চিন্তা, কল্পনা ও প্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাহত হলে কবি আর কবিরূপে সক্রিয় থাকতে পারে না। বিজ্ঞানীর মতো কবিও ধার্মিক হতে পারেন, কিন্তু ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদের সংগে প্রকৃত কবিত্বের সহাবস্থান অসম্ভব। তাই ধর্মের নামে চারিদিকে নানান অপকর্মের অনুষ্ঠান দেখে 'তবে মানুষ হলাম কেন' এই জিজ্ঞাসা বাংলাদেশের প্রধান কবি শামসুর রহমানের অন্তরে বাজতে থাকে। মাসিক 'আহ্বান' এর পূর্বোক্ত সংখ্যাতেই পুনর্মুদ্রিত শামসুর রহমানের রচনাটি দেখি, কবি লক্ষ্য করেন, ইসলামকে রক্ষার সোল এজেন্সি যারা নিয়েছে তারা যে কোনো অছিলায় এদেশের যুক্তিবাদী, মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন শিল্পী—সাহিত্যকর্মের বিরুদ্ধে সরলমতি মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করে।" সে চেষ্টারই প্রকাশ দেখা যায় আমিরুল হাসান, বেগম সুফিয়া কামাল, কবীর চৌধুরীর মতো শিল্পী কবি বুদ্ধিজীবীকে নানাভাবে হেনস্থা করার মধ্যে ; বর্ষীয়ান প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবী, গবেষক এবং সৎসাহসী ডক্টর আহমদ শরীফের ফাঁসি দাবি কারার মধ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মসজিদ কমপ্লেক্সে হামলা চালিয়ে ত্রিশটি কুরআন শরীফসহ কয়েকশ' ধর্মীয় পুস্তক পুড়িয়ে ফেলার মধ্যে। এইসব দেখে শুনে বিক্ষুব্ধ কবি শামসুর রহমান লেখেন—"যারা ক্ষমতা দখলের জন্যে ধর্মকে ব্যবহার করতে দক্ষ, তারা চটজলদি একটা পাথরের নুড়িতে বিরাট মহল বানিয়ে ফেলেন। তারা সব সময় অজুহাতের ফিকিরে থাকেন। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের

আস্থাশীল ব্যক্তিরা কখনো এক ধরনের ফ্যাসিবাদী অপকৌশল গ্রহণ করেন না। আসলে তারা তাদের ফ্যাসিবাদী আচরণ দিয়ে শান্তির ধর্ম ইসলামকেই কলুষিত করছেন।"

একদেশে মসজিদ ভাঙ্গার বিপরীতে আরেক দেশে মন্দির ভাঙ্গাও যে শান্তির ধর্ম ইসলামকেই কলুষিত করা, ফ্যাসিবাদী আচরণকারী ধর্মধ্বজীরাও তা জানে নিশ্চয়। তারা জেনে শুনেই এ রকম আচরণ করে। বোঝা যায়; ধর্মান্ধ বা মৌলবাদীরা কখনো ধার্মিক হতে পারে না। যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী ও সংবেদনশীল কবির মতো যে কোনো সাধারণ হৃদয়বান মানুষও এ বিষয়টি মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেন। তাই গভীরভাবে ধর্মবিশ্বাসী হয়েও আলহাজ্ব আ, ত, ময়মনী নামক একজন চিন্তা-শীল মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে "আল্লাহ্ কি ধর্মনিরপেক্ষ?" তাঁর মতে যেখানে সকল ধর্মই মূলতঃ এক, যেখানে নানা মতে বিভক্ত মানুষ আল্লাহ্র কাছে এক। মানুষ যুগে যুগে তাতে নিজেদের কথা যুক্ত করে এক ও অভিন্ন সত্য, শাশ্বত ধর্মকে শতধাবিভক্ত করেছে। তবে জাগতিক ব্যাপারে আল্লাহ্ সকল মত ও পথের লোকের জন্য নিরপেক্ষ। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দান বায়ু, আলো, ফল, জল ইত্যাদি পার্থিব সকল বস্তুকে সকলের সমান অধিকার। বৃষ্টি যখন নামে তখন হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান সবাই তাতে উপকৃত হয়। সূর্যের আলো এবং চন্দ্রের কিরণ সকল মত ও পথের লোকের জন্য নিরপেক্ষ। তেমনি আমাদেরকেও রাষ্ট্রের ব্যাপারে ধর্মনিরপেক্ষ হতে হবে।" (মাসিক আহ্বান : পূর্বোক্ত সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৩১)

ধর্মান্ধতা-মুক্ত ধার্মিক মানুষের প্রাণের কথাটিই এখানে অভিব্যক্তি পেয়েছে। ভাববাদী, অধ্যাত্মবাদী বা ভক্তিবাদীরও যেমন এটি প্রাণের কথা তেমনি বস্তুবাদী যুক্তিবাদী অজ্ঞেয়বাদী, নিরীশ্বরবাদীসহ মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারী কোনো মানুষই এর বিরোধিতা করবেন না। একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছাড়া একজন সাধারণ সরলপ্রাণ ধার্মিক মানুষ থেকে শুরু করে বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানী সংবেদনশীল শিল্পী কবি বা বুদ্ধিজীবী পর্যন্ত কোনো মানুষেরই স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব নয়। মানবধর্ম বা মনুষ্যত্বই মানুষের আসল ধর্ম। সেই আসল ধর্মের চর্চার জন্য পৃথিবীতে প্রচলিত যে কোনো আনুষ্ঠানিক ধর্ম বা রিলিজিয়ান অনুসরণের প্রয়োজন কেউ রোধ করতে পারে, কেউ তাকে অনাবশ্যকও মনে করতে পারে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের কিছু বলার বা করার থাকতে পারে না। মানুষের আসল ধর্ম মনুষ্যত্বের যারা বিরোধী, তারাই নানাভাবে রাষ্ট্র ও রিলিজিয়ানের অশুভ মিশ্রণ ঘটায়, রাষ্ট্রধর্ম বা ধর্মরাষ্ট্রের সৃষ্টি করে রক্তের মূল্য অর্জিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রে এদের বিরুদ্ধে সংগ্রামই আজ প্রকৃত ধর্মসংগ্রাম, মনুষ্যত্বের জন্য, মানবধর্মের জন্য সংগ্রাম।

(দৈনিক আজকের কাগজের ১০ই ফেব্রুয়ারী, ৯৩ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে)

পরিচালক : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

## তিফল যারা

ছোট্ট কচি
তিফল যারা
মিষ্টি হাসি
ভুবন ভরা,
তাদের মালায়
ঘিরব ধরা।
বেহেশ্‌ত হতে
কলির মতন
শুভ্র প্রাতে
ফুটলো অরুণ
তাদের আলোয়
জাগবে সকাল
মুছবে আঁধার
ঘুঁচবে অকাল

ছোট্ট কচি
তিফল যারা
চপল কথন
আকুল করা,
ব্যাকুল প্রাণে
ক্লান্তি হরা
তাদের সেবার
কোমল ছোঁয়ায়
সারবে জরা
ভাগবে মরা,
জাগবে নতুন
প্রাণের ধারা
তাদের গড়ার
আকুল পারা
গাইছেন ইমাম
জগৎ জোড়া।

—মুহাম্মদ সেলিম খান

---

### চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় তিফলের কৃতিত্ব

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিসে আতফালুল আহমদীয়ার একজন তিফল মরহুম মৌঃ শামসুজ্জামান সাহেবের নাতী মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান রিয়েল, পিতা—জনাব মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান ১৯৯৩ইং সনে অনুষ্ঠিত শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় থানা ও জেলা পর্যায়ে পেন্সিল স্কেচ ও জল রং বিষয়ের উপর 'ক' গ্রুপ হতে দু'টিতেই প্রথম স্থান লাভ করার গৌরব অর্জন

(অবশিষ্টাং ৪৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

# সংবাদ ঃ

## ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে আহমদী জামাত প্রধানের বাঙ্গালী জাতি ও স্বাধীন সাংবাদিকতার প্রশংসা করে ঐতিহাসিক বক্তব্য পেশ

১০, ১১ ও ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৬৯তম বাৎসরীক জলসা ৪, বকশীবাজার ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কয়েক হাজার আহমদী অংশ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব ১২ই ফেব্রুয়ারী লণ্ডন মসজিদে নির্দ্ধারিত জুমুআর খুতবায় জলসায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি লক্ষ্য রেখে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে তাঁর খুতবায় বাংলাদেশের আহমদী এবং জনগণের প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন। ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে এই খুতবা পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশে সম্প্রচার করা হয়।

আহমদীয়া জামা'ত প্রধান বলেন, বাংলাদেশের আহমদীয়া অত্যন্ত সাহসী। বিগত দিনে চার নম্বর বকশীবাজারে মোল্লাদের সহযোগিতায় কিছু সংখ্যক লোক আক্রমণ চালায় এবং মসজিদে হামলা চালিয়ে নামাযীদেরকে মারাত্মকভাবে আহত করা হয়। কুরআন শরীফ জ্বালিয়ে ফেলা হয়। লাইব্রেরীর মূল্যবান পুস্তকাদিসহ বহু সম্পদ ধ্বংস করে ফেলা হয়। কিন্তু ওখানকার আহমদীরা এতে ভীত না হয়ে ধৈর্যের সংগে এই আঘাতকে কাটিয়ে উঠেন।

আহমদী জামা'তের আন্তর্জাতিক নেতা বলেন, বাঙ্গালী জাতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম-বুদ্ধি-সম্পন্ন। ওখানকার বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিকরা অত্যন্ত সাহসী এবং নির্ভিক। তাঁরা মোল্লাদের জঘন্য কার্যকলাপের নিন্দা করে বিবৃতি দেন এবং সংবাদ পরিবেশন করেন। সংখ্যাগুরু নিজ সমাজের অপকর্মের বিরুদ্ধে এভাবে স্পষ্ট নিন্দা করা সহজ কাজ নয়। বাঙ্গালী জাতি যেহেতু মূলতঃ সত্যপরায়ণ এবং ইনসাফের অধিকারী সেজন্যই তাঁরা এভাবে বক্তব্য বিবৃতি দিলেও সরকার কিন্তু এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেন। অপরদিকে দেশের জ্ঞানী গুণীজন—সত্যের খাতিরে এহেন ন্যায়-বাক্যও উচ্চারণ করেছেন যে, বাবরী মসজিদ ভাংগা যেমন নিন্দনীয় ব্যাপার তেমনি বকশীবাজারে এবং রাজশাহীতে আহমদীয়া মসজিদ ভাংগাও অপরাধ। বাবরী মসজিদ ভাংগা যেমন অন্যায় তেমনি আহমদীয়া মসজিদ ভাংগাও অপরাধ। খলীফা সাহেব সব শেষে বাংলাদেশের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করেন এবং বলেন যে, যে জাতি এহেন ন্যায়পরায়ণ সেই জাতি ভবিষ্যতে অবশ্যই উন্নতি করবে, অবশ্য যদি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং সরকারের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার উন্মেষ ঘটে এবং সত্য প্রকাশে কার্পণ্য করা না হয়।

( খবর ঃ প্রেস বিজ্ঞপ্তির )

# শুভ বিবাহ

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ বরকত ও রহমতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামা'তের জনাব আবু ইসহাক সাহেবের পুত্র জনাব নূর আহমদ এর সহিত গত ২১শে ফেব্রুয়ারী নাখাল পাড়া, ঢাকাস্থ মরহুম জনাব মজনু মিয়া সাহেবের কন্যা জ্যোচ্ছনা আখতারের শুভ বিবাহ ৪০,০০১ ( চল্লিশ হাজার এক ) টাকা দেন মোহর ধার্যে সম্পন্ন হয়। বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মোয়াল্লেম হোসেন আহমদ সাহেব। এই বিবাহ যাতে বরকতপূর্ণ হয় এবং তাদের পরবর্তী বংশধররা যাতে জামা'তের জন্য নিবেদিত কর্মী হতে পারে তার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

মনির আহমদ বাদল

বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ইং রোজ শনিবার নারায়ণগঞ্জ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ১৯০/১ কলেজ রোড নিবাসী মৌঃ বদর উদ্দিন আহমদ সহেবের তৃতীয় পুত্র জনাব এডভোকেট তাইজউদ্দিন আহমদ সাহেবের শুভ বিবাহ মুন্সীগঞ্জের রমযানবেগ নিবাসী জনাব মোঃ গোলাম হোসেন সাহেবের একমাত্র কন্যা মোসাম্মাৎ জুয়েলা বেগম ( দীবা )-এর সহিত ৫০ ০০১ (পঞ্চাশ হাজার এক টাকা ) দেন মোহর ধার্যে নারায়ণগঞ্জ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মিলনায়তনে সুসম্পন্ন হয়।

মাওলানা ফারুক আহমদ শাহেদ সাহেব, সদর মুরব্বী উক্ত বিবাহের এলান করেন। উক্ত বিবাহ মজলিসে উপস্থিত সমস্ত মোমেন ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের সমন্বয়ে উক্ত বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য ইজতেমায়ীভাবে দোয়া করেন মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব, সদর মুরব্বী।

সকল আহমদী ভাই বোনদের খেদমতে বর ও কনের দীনি ও দুনিয়াবী এবং রূহানী উন্নতির জন্য বিশেষ দোয়ার আবেদন করিতেছি।

মঈনউদ্দীন আহমদ
নারায়ণগঞ্জ

গত ৮ই জানুয়ারী, ১৯৯৩ তারিখে বাদ জুমুআ আমার জেষ্ঠ্যপুত্র শহিদুর রহমান খান এর সহিত চরসিন্দুর জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মফিজউদ্দিন আহমদ সাহেবের তৃতীয়া কন্যা খোশনাহার বেগমের শুভ বিবাহ কন্যার পিত্রালয়ে ৪০,০০০ ( চল্লিশ হাজার ) টাকা দেনমোহর ধার্যে অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহ পড়ান জনাব মুহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব।

এই বিবাহ যাতে সকল দিক হতে বা-বরকত হয় সেজন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

জিল্লুর রহমান খান
ক্যাশিয়ার, আঃ, মুঃ জামাত, বাংলাদেশ, ঢাকা

## শোক সংবাদ

আমার আব্বা মোঃ কেরামত আলী গাজী মীরগাং, হালকা, সুন্দরবন জামা'ত ২রা মাঘ ৯৯ তারিখে ইন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন) তাহার রূহের মাগফেরাত কামন করিয়া পাক্ষিক আহমদী পত্রিকার মাধ্যমে আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের নিকট দোয়ার আবেদন জানাইতেছি।

নূর মোহাম্মদ
সুন্দরবন

২০/এ/বি এবং ২১/এ/এ ১ম কলোনী গাবতলী মিরপুর নিবাসী এস, এম, মোতাহার আলম পিতা মরহুম এস, এম, আসগর হোসেন গত ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৯২ইং রোজ বুধবার ঢাকাস্থ শহীদ সোহ্‌রাওর্দী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন—(ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৫৯ বছর। তাঁহার রূহের মাগফেরাতের জন্য সবার নিকট দোয়ার আবেদন জানাইতেছি।

কাজী আবদুশ্‌ শাকুর
মীরপুর

---

( ৪৬ পাতার পর )

করে। আঞ্চলিক পর্যায়ে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত পেন্সিল স্কেচ্‌ এ দ্বিতীয় ও জল রং এ প্রথম স্থান অধিকার করে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা করার সাফল্য অর্জন করে। গত ১৬/২/৯৩ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় জল রং বিষয়ের ওপর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার সম্মান লাভ করে। আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। তিফল ভাইয়ের এই অসাধারণ সাফল্যের জন্যে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। 'ছোটদের পাতা'-এর পক্ষ থেকে আমরা তাকে মোবারকবাদ জানাই এবং তার উত্তরোত্তর উন্নতির জন্যে দোয়া করি। তার মেধা যেন ইসলামের বিশ্ব বিজয়ে নিবেদিত হয় সেজন্যেও আমরা দোয়া করছি।

সম্পাদকীয়ঃ

# অপূর্ব !—অভূত পূর্ব !!

নীরব নিভৃত গ্রাম কাদিয়ানের হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে (আঃ) আল্লাহতা'লা আজ থেকে শতবর্ষপূর্বে জানিয়েছিলেন—য়্যায় তেরি তবলীগ কো যমীন কে কিনারো তক পোহুঁচাউঙ্গা। আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব (তাযকিরা)। মুসলিম টি, ভি, আহমদীয়া এর মাধ্যমে আজ এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রতি শুক্রবার আহমদী জামাতের খলীফার খুতবা লণ্ডন মসজিদ থেকে সরাসরি ভূউপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশে প্রচারিত হচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ টি, ভি, তে খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-কে নিজ চক্ষে দর্শন করছেন এবং তাঁর মূল্যবান বাণী শ্রবণ করছেন। গত ১২ই ফেব্রুয়ারী ছিল বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৬৯ তম সালানা জলসার শেষ দিন। ঐ দিন আহমদী জামাতের আন্তর্জাতিক ইমাম লণ্ডন থেকে সরাসরি জলসায় উপস্থিত আহমদী এবং অ-আহমদীদেরকে লক্ষ্য করে খুতবা প্রদান করেন। তিনি বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক এবং আহমদীদের প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশের জন্য দোয়া করেন।

এখানে এও উল্লেখ্য যে, পবিত্র কোরআন এবং হাদীসে ইবনে মরিয়ম ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে নাযিল হবেন এমন কোন কথা নেই। তবুও মোল্লা মৌলবী সাহেবরা জিদ ধরেছেন, ইবনে মরিয়ম আকাশ থেকে সশরীরে অবতীর্ণ না হলে এবং বিশ্ববাসী তা নিজ চক্ষে দর্শন না করলে তারা ঈমান আনবেন না। আল্লাহতা'লা তাই ইতমামে হুজ্জত করে এক ইবনে মরিয়মকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আকাশের মাধ্যমে সমগ্র জগদ্বাসীর সম্মুখে উপস্থিত করছেন। আহমদী জমাতের বর্তমান খলীফার মায়ের নাম ছিল মরিয়ম। তাই খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) ইবনে মরিয়ম। আর এই ইবনে মরিয়মকে সমগ্র বিশ্ববাসী আকাশ পথে ধারণকৃত ডিস এন্টিনার মাধ্যমে টি, ভি, তে অবতীর্ণ হতে দেখছেন। আসুন, দেখুন এবং আহমদীয়াতের সত্যতা উপলব্ধি করুন। মোল্লা মৌলবী সাহেবরা! আকাশ পথে ইবনে মরিয়মের (আইঃ) আবির্ভাব দেখেও কি ঈমান আনবেন না?

(নির্বাহী সম্পাদক)

---

"সেই ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত; কারণ সে (দুরাশয় ব্যক্তি) নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ্ সাধু ব্যক্তিকে ধ্বংস ও বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন; বরং তিনি তাহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা এখনও করিবেন।" ['আমাদের শিক্ষা' ৯৭ পৃঃ] —হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)

## মালী (আর্থিক) কুরবানী

- মুত্তাকী ও মুমেন হওয়ার পথে একটি বিশেষ পদক্ষেপ,
- ঈমানরূপ বৃক্ষকে সদা সজীব রাখে,
- একটি মাপ কাঠি যদ্বারা ব্যক্তি ও সমাজের ঈমানের স্তরকে সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায়,
- রীতিমত করলে ইহা ধন-সম্পদকে বহুগুণে সমৃদ্ধশালী করে এবং পবিত্র করে,
- দ্বারা বায়তুল মালকে শক্তিশালী না করলে ইসলাম প্রচারের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না,
- দ্বারাই এ যুগে ইসলামের সেবা করার অন্যতম উৎকৃষ্ট পন্থা। এ যুগে প্রাণ চাওয়া হয় না, যথাসাধ্য কুরবানী করার মাধ্যমে প্রতিশ্রুত জান্নাতের অধিকারী হওয়া যায়।

তাই ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বছরে আপনার পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

- হিসাব দেখে এমনভাবে চাঁদা আদায় করুন যেন ৩০-৬-৯৩-এর মধ্যে আপনার বাজেটকৃত চাঁদা সম্পূর্ণ আদায় হয়ে যায়।
- মাহে রমযান মালী কুরবানী করার প্রকৃষ্ট সময়। আঁ-হুযরত (সাঃ) এ মাসে ঝড়ের গতিতে মালী কুরবানী করতেন।
- এ মাসে তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায় করে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর বিশেষ দোয়ার অংশীদার হোন।
- আপনি কি বকেয়াদার? যদি হন তাহলে কিস্তিতে বকেয়া আদায় করার মনোভাব গ্রহণ করুন। যদি অপারগ হন তাহলে এ বছরের পূর্ণ চাঁদা আদায় করতঃ স্থানীয় জামাত ও ন্যাশনাল আমীর সাহেবের মাধ্যমে হুযুর (আইঃ)-এর নিকট মাফির দরখাস্ত করতে পারেন।
- যদি নির্ধারিত হারে চাঁদা দিতে অপারগ হন তবে কারণ দর্শিয়ে উপরোক্ত নিয়মে হুযুর (আইঃ)-এর নিকট আবেদন করে কম হারে চাঁদা দেয়ার সুযোগ গ্রহণ করুন।
- মনে রাখবেন আল্লাহ্‌তা'লা আপনার অবস্থা সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত রয়েছেন।
- নিজে আমল করুন ও অন্যকে আমল করতে উদ্বুদ্ধ করুন।

সাহেবুল কাহ্‌ফ

# আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্‌" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যা[illegible] এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে [illegible]ক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে ম[illegible] অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"

অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্‌ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
নির্বাহী সম্পাদক ঃ আলহাজ এ, টি, চৌধুরী

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the p oprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan
Executive Editor : Alhaj A. T. Chowdhury